সরসঙ্ঘচালকের ভাবনা
বিজ্ঞানসম্মত বলেই
গ্রহণযোগ্য
— পৃঃ ১১

দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

মোহনজীর ভাবনা
ভারতীয়ত্বেরই ভাবনা
— পৃঃ ২৬

৭৩ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা।। ১৬ আগস্ট, ২০২১ ।। ৩০ শ্রাবণ - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

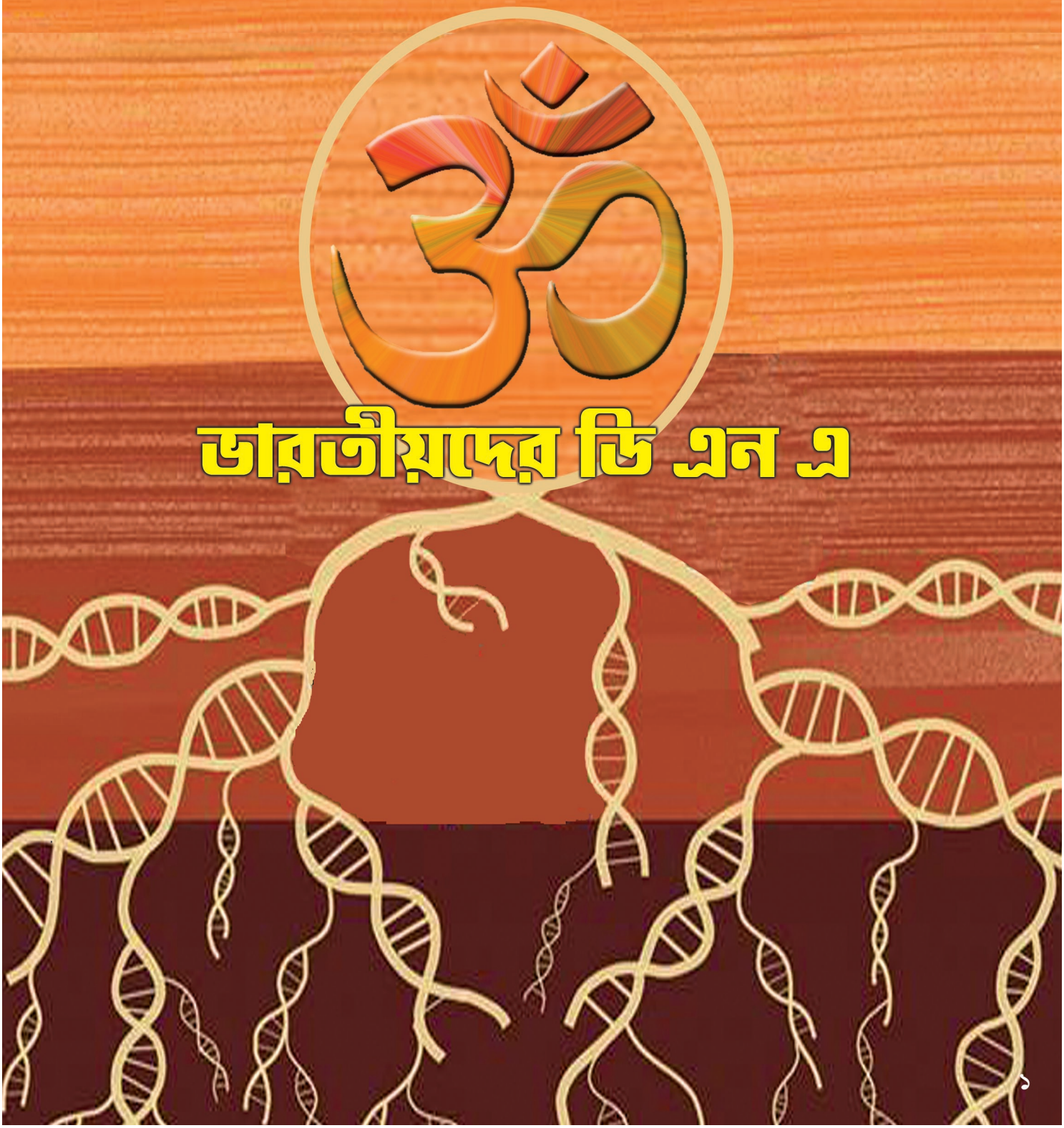

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

(৫১)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ৩০ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১৬ আগস্ট - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

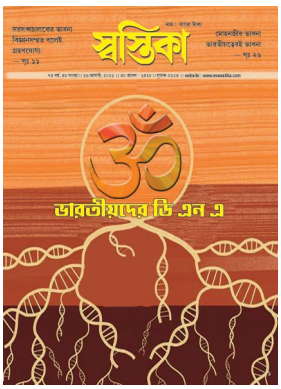

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

তৃণমূলের রাজনীতি গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ৬

দিল্লি কি দিদিকে চায় ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের স্থপতি লোকমান্য তিলক ☐ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ☐ ৮

ব্রিটিশ সরকার তাঁর মাথার দাম রেখেছিল সাড়ে সাত হাজার টাকা ☐ শুক্লা সিকদার ☐ ১০

সরসঙ্ঘচালকের ভাবনা বিজ্ঞানসম্মত বলেই গ্রহণযোগ্য ☐ বিমল শংকর নন্দ ☐ ১১

জাতীয় ঐক্যের বিরোধিতায় তোষণ রাজনীতির কুশীলবেরা ☐ নিখিল চিত্রকর ☐ ১৩

অপরাধ কমাতে সুশিক্ষা দেওয়ার ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক ☐ শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ১৪

তালিবানের প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে জঙ্গিগোষ্ঠীদের আরো উৎসাহ জোগাবে ☐ রঞ্জন কুমার দে ☐ ১৬

ডিএনএ নিয়ে দু'চার কথা ☐ অনামিকা দে ☐ ২৩

উপাস্য বদলালে জিনের বদল হয় না ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ২৪

মোহনজীর ভাবনা ভারতীয়ত্বেরই ভাবনা ☐ সুজিত রায় ☐ ২৬

ডিএনএ কোডিঙে প্রমাণিত আর্য আক্রমণতত্ত্ব মিথ্যা ☐ চন্দ্রচূড় গোস্বামী ☐ ৩০

শাওনকে ঝুলে থেকে আজকের ঝুলনযাত্রা ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

হাজার মনের একটি বাঁধন ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ☐ ৩৩

ভারতভূমি অতীতের অনেক বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের দাবিদার ☐ ড. শুভময় দত্ত ☐ ৩৫

অলিম্পিকে পিভি সিন্ধুর অসামান্য জয় ☐ নিলয় সামন্ত ☐ ৩৯

হিরোসিমায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কারণ আজও রহস্যাবৃত ☐ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ☐ ৪৩

চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা আর কসাই-এর সাক্ষী সন্ত্রাসবাদী ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ৪৫

খেতাবের চন্দ্রিল খ্যাতিতে চন্দ্রশেখর ☐ ডাঃ আর এন দাস ☐ ৪৭

গোবর থেকে মাছের খাবার তৈরি ☐ শান্তি মণ্ডল ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ☐ ভাবনাচিন্তা : ২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐

প্রকাশিত হবে ২৩ আগস্ট ২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৩ আগস্ট ২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

অলিম্পিকে ভারত

এবারে অলিম্পিকের আসর জাপানের রাজধানী শহর টোকিয়োয়। ক্রিকেট বা ফুটবল নিয়ে ভারতীয়দের যে মাতামাতি অলিম্পিক নিয়ে সেই আগ্রহ দেখা যায় না। কারণ ভারতের মতো এত বিশাল জনসংখ্যার দেশ হয়েও অলিম্পিকে আমাদের পারফরম্যান্স আশানুরূপ হয় না। কিন্তু এবার টোকিয়ো অলিম্পিকে ভারতের পারফরম্যান্স পেছনে ফেলে আসা সব অলিম্পিককে ছাপিয়ে গেছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে অলিম্পিকে ভারতের সাফল্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ান। লিখবেন বিশিষ্ট লেখকেরা।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৮

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও লেখকদের লেখায় ভরে উঠবে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যা।

।। দাম : ৫০.০০ টাকা।।

আপনার কত কপি প্রয়োজন সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জানান।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আচার পরিবর্তনশীল, পূর্বপুরুষ নহে

ভারতবর্ষ এক অতি প্রাচীন দেশ। এই দেশের প্রাচীন নাম হিন্দুস্থান বা আর্যাবর্ত। আজও এই দেশের অধিবাসীরা বিদেশে হিন্দুস্থানী রূপে পরিচিত। বিভিন্ন জাতীয় সংস্থার নামের সঙ্গে আজও হিন্দুস্থান শব্দটি জড়িত (হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্ ইত্যাদি)। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের হিসাব বাদ দিলেও শুধুমাত্র কলিযুগের বয়স ৫১২৩ বৎসর। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই দেশ তাহার পৌরাণিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক গরিমা বহন করিয়া চলিয়াছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ দেবভূমি, পুণ্যভূমি, মোক্ষভূমি হিসাবে পরিচিত। ভারতবর্ষের আত্মীয়তার ভাবনা শুধুমাত্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া মুনিঋষিরা বলিয়াছেন—বসুধৈব কুটুম্বকম্। এদেশের ধর্মও যুগ যুগ ধরিয়া সনাতন হিন্দু ধর্ম রূপে বিবেচিত। বিদেশ থেকে বিধর্মী আক্রমণকারীরা এখানে আসিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছেন। দেশের মানুষের সহিত পূজাপদ্ধতির বৈচিত্র্য রাখিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়া তীর্থঙ্কর মহাবীর জৈনধর্ম প্রবর্তন করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধদেব এই দেশের দুঃখকষ্ট অনুভব করিয়া মানবকল্যাণে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করিয়াছেন। তাহাতে এই দেশের মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় নাই। কোনো ব্যক্তি যদি বলেন, বৌদ্ধ ও জৈনরা আসলে হিন্দুর রক্ত বহন করিতেছে—তাহা কি মিথ্যা? তাহা হইলে গত কয়েকদিন পূর্বে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহন ভাগবত গাজিয়াবাদের একটি সভায় মুসলমান পণ্ডিতের লেখা পুস্তকের উন্মোচন করতে গিয়া যে কথা বলিলেন, এই দেশে হিন্দু ও মুসলমানদের রক্তে একই ডিএনএ বর্তমান— এর মধ্যে ভুল কোথায়? ইসলাম ধর্ম তো বৌদ্ধ ও জৈনের তুলনায় অনেক নবীন। ১৪০০ বৎসর পূর্বে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে ভারতবর্ষে যে সকল মানুষ বসবাস করিত তাহাদের ধর্ম কী ছিল? ভারত মুসলমানদের আদি বাসস্থান নহে। মধ্য এশিয়া হইতে কতিপয় আরব ও তুর্কি দেশীয় মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তার ও লুণ্ঠনের অভিলাষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। তাহাদের অমানবিক অত্যাচারের ফলেই এ দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের একাংশ ইসলাম গ্রহণ করেন। সনাতন হিন্দুদের মধ্যেও কালক্রমে অনেক মত পন্থের সূচনা হইয়াছে—যাহা আজও শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবরূপে বিদ্যমান। পূজাপদ্ধতি, আচার-বিচার পরিবর্তন হইলেও দেশের রক্ত, হৃদয়, মস্তিষ্ক পরিবর্তন হওয়ার কথা নহে।

আসলে এই সকল বিকৃতি বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী নেতা ও মৌলবাদীদের আপাত ভ্রম সৃষ্টি করিবার প্রয়াস। শ্রী ভাগবত তাঁহার বক্তব্যে যথেষ্ট সাবলীল ভাষায় মুসলমান সমাজের পণ্ডিতদের সামনে বিচার স্পষ্ট করিয়াছেন। সঙ্ঘকে মানুষ চেনে ও জানে। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হইতে শুরু করিয়া অন্যান্য সরসঙ্ঘচালগণ বিভিন্ন ভাষায় একই ভাব প্রকট করিয়াছেন। সঙ্ঘ শুরুতে যখন শুধুমাত্র নাগপুর শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তখনই ডাক্তারজী দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন— হিন্দুস্থান হিন্দুদের। শ্রী ভাগবত পূর্বেই বলিয়াছিলেন— এই দেশে জন্মগ্রহণ করিলেই সমস্ত ভারতবাসী হিন্দু। স্বার্থান্বেষী মানুষের অন্ধ আবেগে এই কথা অপছন্দ হইতে পারে, বিতর্ক হইতে পারে। কিন্তু যাহা সত্য তাহা চিরকালই সত্য। মুসলমানদের কিছু উদারচেতা মানুষ মুক্তকণ্ঠে মানিলেও কিয়দংশের মনে বিতর্ক দানা বাঁধিয়াছে। তাহারা মানিলেও প্রকাশ করিতে নারাজ। পরিতাপের বিষয় হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও আংশিক ভাবে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়াছে। মানুষের আচার পরিবর্তনশীল, পূর্বপুরুষ নহে। সুতরাং ভোটসর্বস্ব রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া হিন্দু-মুসলমান বিতর্কের মধ্যে না গিয়াও এই ভাবনা সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য। আসলে সকলে রাজনীতির আবহে ক্ষমতার অলিন্দে নিজেকে পরিচিত করিতে অভ্যস্ত। তাই সোজাকথা সোজাভাবে বলিলে শুরুতে বিতর্ক হইলেও ভবিষ্যতের জন্য তাহা উপকারী। শ্রী ভাগবত যাহা বলিয়াছেন তাহা সমাজের কথা, মুনিঋষিদের আদেশ, পরম্পরার ধারক, বাহক ও সমাজ কল্যাণকারী। এই ধারা আজীবন প্রবাহিত থাকিবে—ইহাই সার্বিকভাবে কাম্য।

সুভাষিতম্

উত্তমো নাতিবক্তা স্যাৎ অধমো বহু ভাষতে।

ন কাঞ্চেন ধ্বনিস্তাদৃক্ যাদৃক্ কাংস্যে প্রজায়তে।।

উত্তম ব্যক্তিরা বেশি কথা বলেন না। অধম ব্যক্তিরা বেশি কথা বলে। যেমন কাঁসার যত শব্দ হয়, সোনার তত হয় না।

তৃণমূলের রাজনীতি গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক

ত্রিপুরায় যা ঘটছে বলে দেখা যাচ্ছে, মূলত সোশ্যাল মিডিয়ায় ও কিছু বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে তা যে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের পক্ষে একেবারেই মানানসই নয়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাহ্যত দৃশ্যমান সকল ঘটনাকে সত্যি বলে ধরে নিলে সেটা আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই সুবিবেচনাপ্রসূত হবে না। লাগাতার তৃণমূলের বিভিন্ন প্রতিনিধিদল ত্রিপুরায় সফরসূচি করছেন। আর ত্রিপুরার শাসকদল তাদের ওপর হামলা করছে, মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে বলে উত্তেজক নানা ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করছে। এর মধ্যে একটি ভিডিয়োর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই ভিডিয়োয় কোথাও কিন্তু মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকি রক্তারক্তি কাণ্ড কিছুই চোখে পড়ছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে, এক তৃণমূল যুবনেতা আকুল হয়ে চিৎকার করছেন, আমার মাথা ফাটিয়ে দিল বলে। আরেক ইউটিউবার যুবনেতা নানারকম বীভৎসতার অভিযোগ তুলছেন। কিন্তু সেই অভিযোগের কোনো দৃশ্যমানতা অন্তত সেই ভিডিয়ো কেন, কোনো ভিডিয়োতেই চোখে পড়েনি। বরং তাঁকে তড়িঘড়ি কলকাতায় এনে একটি বিলাসবহুল নার্সিংহোমে ভর্তি করানোর পরে, রাজ্যের শাসকদলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখতে যাওয়ার যে ফুটেজ সামনে এসেছে, তা যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়। যার মাথা ফেটে চৌচির হয়েছে বলে অভিযোগ, মাত্র ৩৬ ঘণ্টার ব্যবধানে তাঁর মাথার ব্যান্ডেজ খুলে গেল কোন মন্ত্রবলে? মাথায় কি তবে স্টিচ হয়নি? হাসপাতালে ভর্তির দরকার তবে হলো কেন?

যার মাথায় অমন গুরুতর আঘাত তার মস্তকে মুখ্যমন্ত্রীর হাত বুলনোর ফুটেজও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে সামনে এসেছে।

(সঙ্গের ছবি দ্রষ্টব্য) তাহলে এই প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয় যে, আঘাতটা ওই তৃণমূল যুবনেতার মাথায় সত্যিই লেগেছিল তো? নাকি এটা শুধুই গিমিক? আরও একটা ভিডিয়ো ফুটেজ যা সামনে এসেছে, তাতে আবার দেখা যাচ্ছে, এক দাপুটে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন নেত্রী, বর্তমানে যুবনেত্রীর বাইক ভাঙচুর করে গুণ্ডামির দৃশ্য। মুশকিল হলো, ত্রিপুরায় যা ঘটছে বলে দেখানো হচ্ছে তা একতরফা। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলপন্থী সংবাদমাধ্যমের মূল উদ্দেশ্য হলো ত্রিপুরায় জনগণের নির্বাচিত সরকারকে অগণতান্ত্রিক দেখিয়ে ত্রিপুরায় ২০২৩-এর বিধানসভা নির্বাচনের জমিটা তৃণমূলের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা। এবারের পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী সাফল্য পাওয়ার পর থেকেই বিজেপিকে সবক শেখাতে উঠে পড়ে লেগেছে তারা। যার প্রথম ধাপ পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী হিংসায় বিজেপি কর্মীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, এলাকাছাড়া করা, মহিলা কর্মীদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, বিজেপির মধ্যে থাকা 'ট্রয়নগরীর ঘোড়া'দের পুরস্কারস্বরূপ আস্তে আস্তে দলে ফিরিয়ে দলীয় দায়িত্বে আসীন করা। পাঠকের মনে থাকতে পারে, তেমনি একজনের ওপর ভর করে ত্রিপুরা জয়ে ঝাঁপানোর আগাম ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এই বিষয়টি মাথায় রাখলে সহজেই ধরে ফেলতে পারবেন ত্রিপুরায় তৃণমূল কী খেলা খেলছে। তৃতীয়ত, বিরোধী ঐক্য-গঠনের নামে দিল্লিতে একটা ঘোঁট পাকানো। খেয়াল করে দেখবেন, ইতিমধ্যেই এই সবকটি খেলা চালু করে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। একটা কথা ভেবে দেখুন, তৃণমূলের যেখানে বিন্দুমাত্র কোনো সংগঠন নেই, সেখানে বারংবার সদলবলে যাচ্ছেন কেন নেতারা? বলতে পারেন, এটা যে কোনো রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাহলে কোনো প্রদেশে তৃণমূলের ভাষাতেই বলি 'বহিরাগত' রাজনৈতিক-নেতৃত্ব প্রবেশ করলে সেখানকার পুলিশ উপযুক্ত খোঁজখবর নিতেই পারে তাদের ব্যাপারে, সেখানকার রাজনৈতিক কর্মীদের বিক্ষোভের মুখোমুখি হতেই পারেন সেই বহিরাগতরা। এর সবটাই কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে।

কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক অধিকারের সুযোগ নিয়ে তৃণমূল যেভাবে ত্রিপুরায় পায়ের তলায় মাটি পেতে চাইছে, কলকাতা থেকে নেতা-মন্ত্রীরা গিয়ে সেখানকার পুলিশ-প্রশাসনকে গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন, ওই রাজ্যের শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তুলে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছেন— পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের পক্ষে যে এটা নেহাতই দুর্ভাগ্যজনক তা বলাই বাহুল্য। আরও দুর্ভাগ্যজনক, তৃণমূলের প্রচার করা কোনও ভিডিয়োর সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই, সেই ভিডিয়োর ভিত্তিতে স্টোরি করছে আর এরাজ্যের বিজেপি কর্মীদের আক্রমণ করার তৃণমূলী নৈতিকতায় মদত জোগাচ্ছে এ রাজ্যের কিছু মিডিয়া। ফলে দেশের গণতান্ত্রিকতায় এই চিত্রটা যে আগামীর জন্য আরও বিপজ্জনক ইঙ্গিত বহন করছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দিল্লি কি দিদিকে চায়

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা

কাউন্ট ডাউন শুরু করুন। মাঝে আর দুটো বছর। তারপরেই দিদি প্রধানমন্ত্রী। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না! দিদি কিন্তু বিশ্বাস করছেন। দিদির ভাইরাও। এবার দিদি যে জোট করবেন তাতে আবার গান্ধী পরিবারের কোনও মুখ থাকবে না। দিল্লিতে দিদি কদিন আগেই সফরের সময় সব পরিকল্পনা করে এসেছেন। জোটের চেহারা খুব তাড়াতাড়ি দেখা যাবে। দিদি এতদিন পশ্চিমবঙ্গের ৪২ কেন্দ্রে প্রার্থী হতেন। এবার হবেন দেশের ৫৪২ কেন্দ্রে।

জোট গড়তে এখন থেকেই মাঝ রাতে বৈঠক শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহকে পর্যুদস্ত করতে সোমবার গভীর রাতে দিল্লিতে গান্ধী পরিবারকে নিয়ে একজোটে অসন্তোষ জানালেন বিরোধী শিবিরের নেতারা। বক্তব্য, গান্ধী পরিবারের 'মুঠো' থেকে বেরিয়ে না এলে না বাঁচবে কংগ্রেস, না মাথা তুলে দাঁড়াবে বিরোধী জোট। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলের আমন্ত্রণে একছাদের নীচে জড়ো হয়েছিলেন বিজেপি বিরোধী বহু নেতা। সেখানে কংগ্রেসকে বিরোধী জোটে আমন্ত্রণ জানালেও গান্ধীদের নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকার বার্তা দিয়েছেন ছোটো-বড়ো প্রায় সব দলের নেতারাই। জোট কতটা হবে সেটা পরের কথা কিন্তু এটা ভালো যে সোনিয়া গান্ধীর আঁচলের তলা থেকে বেরোতে চাইছে কংগ্রেস।

সম্প্রতি বিরোধী জোট নিয়ে দৌত্য করতে দিল্লি গিয়ে দিদি মানে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলাদা করে সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকও করেন। কিন্তু সোমবার সিব্বলের ডাকা নৈশভোজে গান্ধী পরিবারের কারও দেখা মেলেনি। কংগ্রেসের বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে পরিচিত সিব্বলের বাড়িতে বরং গান্ধী পরিবারের সমালোচকদের একটা বড়ো অংশ উপস্থিত ছিলেন। বিরোধী জোট নিয়ে আলোচনায় তাঁদের প্রায় সকলেই গান্ধীদের নেতৃত্ব থেকে দূরে রাখার পক্ষে সওয়াল করেন বলে খবর।

কৃষি আইন নিয়ে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা অকালি দলের নরেশ গুজরালও সোমবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন নবীন পট্টনায়কের বিজু জনতা দলের নেতা বিনাকি মিশ্র। মোদী সকারের একাধিক নীতি নিয়ে সমালোচনা করলেও, বিরোধী জোটের মুখ হিসেবে গান্ধীদের তুলে ধরায় তাঁরা খোলাখুলি আপত্তি জানান বলে জানা গিয়েছে। নরেশ নাকি সাফ জানিয়ে দেন যে বিরোধী জোটের নেতৃত্ব নিয়ে পরেও ভাবা যেতে পারে। আগে কংগ্রেসকে গান্ধীদের 'খপ্পর' থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লার বক্তব্য ছিল, কংগ্রেস মজবুত হলে তবেই বিরোধী জোটের হাত শক্ত হবে। কিন্তু দলের অন্দরেই যেখানে নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, সেখানে কংগ্রেসকে বিরোধী দলের মুখ হিসেবে তুলে ধরা যুক্তিসঙ্গত নয়।

উল্লেখ্য, যে সিব্বলের আমন্ত্রণে বিরোধী শিবিরের নেতারা সোমবার দিল্লিতে সমবেত হয়েছিলেন, সাম্প্রতিককালে গান্ধী পরিবারের অন্যতম সমালোচক হিসেবে উঠে এসেছেন তিনি। নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে যে ২৩ জন নেতা সোনিয়া গান্দীকে চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে শামিল ছিলেন তিনিও। চিঠিতে স্বাক্ষর করা পি চিদম্বরম, শশী তারুর ও আনন্দ শর্মাও বৈঠকে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা লালুপ্রসাদ যাদব, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির নেতা শরদ পাওয়ার, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব, সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি, শিবসেনার সঞ্জয় রাউত, ডিএমকে-র তিরুচি শিবাও।

তৃণমূলের তরফে সোমবারের সমাবেশে হাজির ছিলেন ডেরেক ও' ব্রায়েন। এর আগে, মল্লিকার্জুল খড়্গের ডাকা বৈঠকে রাহুল থাকায় তৃণমূলের রাজ্যসভা এবং লোকসভার কোনও নেতা যাননি। তাই রাহুলকে নিয়ে তৃণমূলের খচখচানি রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে, সিব্বলের ডাকা সমাবেশেও মমতাকে বিরোধী জোটের নেত্রী হিসেবে ডেরেক তুলে ধরেন। ডেরেক জানান, নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্নে গোটা দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন। তাঁকে সমস্ত রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে আক্রমণ করেছিল বিজেপি। তাঁকে সমর্থন করে ওমর জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে হারিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেসও যদি দলকে শক্তিশালী করার জন্য সচেষ্ট হয়, তাহলে সব বিরোধী দলই লাভবান হবে। কিন্তু এত কিছুর পরেও সোজা মনের সোজা প্রশ্নটা যাচ্ছে না।

এই সব বৈঠক যাঁরা করছেন তাঁদের সর্বভারতীয় পরিচিতি কতটুকু? শক্তির কথা না হয় পরে ভাবা যাবে।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের স্থপতি
লোকমান্য তিলক

লোকমান্য তিলক ছিলেন মহারাষ্ট্রের সন্তান। এখানকার রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে দিনযাপনের মধ্য দিয়ে মরাঠীরা হয়ে উঠেছিলেন শারীরিক শক্তিসম্পন্ন ও নির্ভীক। মহারাষ্ট্রের সন্তান তিলক এই পরিবেশেই হয়েছিলেন দৃঢ় নেতা ও কর্মমুখর। গীতার কর্মযোগের আদর্শই ছিল তার চলার পথের দিশারী।

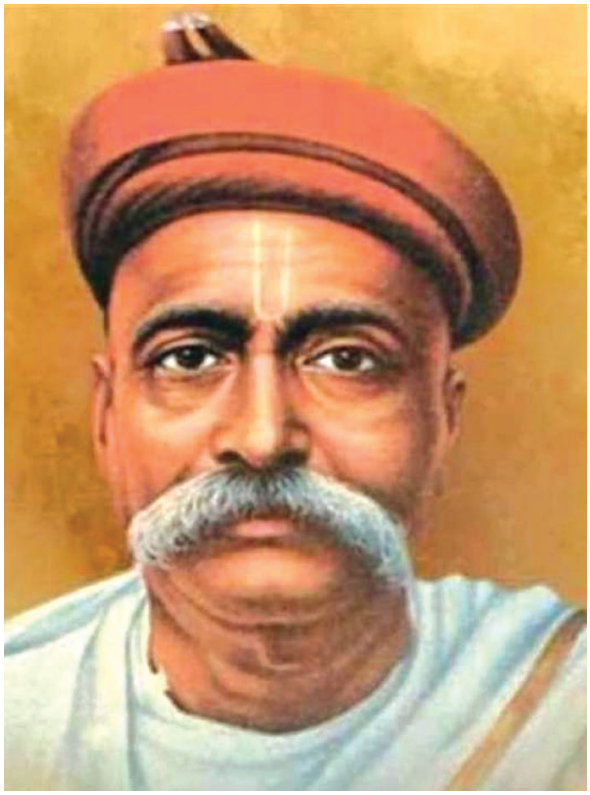

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

আজ থেকে একশো বছর আগে ১৯২০ সালের ১ আগস্ট লোকমান্য তিলকের মহাপ্রয়াণ হয়। তার পরের দিন মহাত্মা গান্ধী দেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হলো। এক কথায় ১৯২০ সালে লোকমান্য তিলকের যুগ শেষ হলো আর শুরু হলো জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর অধিনায়কত্ব। কিন্তু গণজাতীয়তাবাদ ও সক্রিয় প্রতিরোধ সংগ্রাম এ দুইয়েরই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লোগমান্য। ব্রিটিশ সাংবাদিক ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গুণগ্রাহী স্যার ভ্যালেন্টিন চিরল 'Indian Unrest' গ্রন্থে (১৯১২ খ্রি.) তিলককে Father of Indian Unrest' বলে চিহ্নিত করেছেন। তিলকের জন্মশতবর্ষ সমারোহের সময় (১৯৫৬) ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও গান্ধীজীর মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্য জওহরলাল নেহরু তিলককে 'ভারতীয় বিপ্লবের জনক' নামে অভিনন্দিত করেছিলেন। আসলে তিলক ছিলেন ভারতের জাতীয় গণসংগ্রামের প্রথম রূপকার। তাঁর ঐতিহ্য অনুসরণ করে কেউ সশস্ত্র বিপ্লববাদের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর তিলক প্রদর্শিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রণনীতিকে অহিংসার মোড়ক দিয়ে গণ-আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

লোকমান্য তিলক (২৩ জুলাই ১৮৫৬-১ আগস্ট ১৯২০) ছিলেন মহারাষ্ট্রের সন্তান। এখানকার রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে দিনযাপনের মধ্য দিয়ে মরাঠীরা হয়ে উঠেছিলেন শারীরিক শক্তিসম্পন্ন ও নির্ভীক। মহারাষ্ট্রের সন্তান তিলক এই পরিবেশেই হয়েছিলেন দৃঢ় নেতা ও কর্মমুখর। গীতার কর্মযোগের আদর্শই ছিল তার চলার পথের দিশারী। তিনি উপলব্ধি করলেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা শুধু ভিক্ষাবৃত্তি করেন আর বড়ো বড়ো প্রস্তাব নেন। কিন্তু এরা জনগণকে যুক্ত করে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন। স্মরণে রাখা প্রয়োজন উনিশ শতকের শেষ দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ বরাভয় মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন আর দরিদ্র নারায়ণের সেবাকে ধর্মের মূল সোপান বলে চিহ্নিত করেছিলেন। অন্যদিকে রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রী অরবিন্দ ১৮৯৩ সালে হিন্দু প্রকাশ পত্রিকায় New Lamps for the old প্রবন্ধগুচ্ছে জাতীয় রাজনীতিকে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত করে তোলার নির্দেশ দেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দ লেখনির মাধ্যমে যে সংগ্রামী চেতনা আবাহন করেছিলেন, তার বাস্তবায়ন করেছিলেন লোকমান্য তিলক। তিনি জাতীয় রাজনীতির মধ্যে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। আবার তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় চেতনা সঞ্চার করেছিলেন এবং সক্রিয় সংগ্রামী কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। জাতীয় চেতনা সঞ্চারের জন্য তিনি গণপতি পূজা ও শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেন। শিবাজী উৎসব মহারাষ্ট্রের জাতীয় উৎসবে পরিণত হলো।

অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যে মানুষের জীবন চরম দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত হয়। প্রথমে নামে দুর্ভিক্ষের দাপট। তারপর ১৮৯৬ সালে প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। এখন যেমন করোনা মহামারী চীন থেকে ভারত-সহ বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে, সেরকম চীনের বন্দর হংকং থেকে প্লেগ মহামারী প্রথমে বোম্বাই শহরে দেখা দেয়, পরে পুনায় তা চরম আকার ধারণ করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার মহামারী আইন (১৮৯৭ খ্রি.) বলবৎ করে। করোনা মহামারী প্রশমনেও এই আইন জারি করা হয়েছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জোরকদমে মহামারী আইন

প্রয়োগে সচেষ্ট হয়। এর ফলে মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে। মিল শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং হাসপাতালে হামলা চালায়। মানুষের রোষানলের মূল লক্ষ্য ছিলেন পুনার প্লেগ কমিশনার ওয়াল্টার চার্লস র‍্যান্ড। দামোদর চাপেকর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামে দুই তরুণ র‍্যান্ডকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ২২ জুন ১৮৯৭ সালে সুযোগ মিলল। মহারানির হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে করে ফেরার পথে র‍্যান্ড ও তাঁর সহযোগী আয়ার্স্ট চাপেকারদের গুলির আঘাতে নিহত হলেন।

এর পরেই সরকারি মহল তিলকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ২৮ জুলাই (১৮৯৭) তাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেপ্টেম্বরে বিচারে তিলক দোষী সাব্যস্ত হলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, তিলক দেশদ্রোহী আইনে (ভারতীয় দণ্ড বিধির ১২৪ ক ধারা) অভিযুক্ত হলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে কলকাতায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের দমন নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। তাঁর লেখা 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে প্রাজা-বিরোধী রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করা হয়। তাঁর সঙ্গে চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোনো প্রমাণ মেলেনি। এমনকী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের চাপে পড়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো স্বাক্ষ্য প্রমাণ দিতে চাননি। অভিযোগের বিষয়বস্তু হলো শিবাজী উৎসবের সময় তিনি আফজল খাঁর হত্যার স্বপক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। প্রকারান্তরে বোঝানো হলো তিলক হত্যার রাজনীতির সমর্থক। এই সময় তিলকের বিচারে অর্থসাহায্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ তৎপর হলেন। অর্থসংগ্রহ করে এবং তিলকের পক্ষ সমর্থনের জন্য খ্যাতনামা ব্রিটিশ আইনজীবীদের পাঠালেন। প্রসঙ্গত বলা যায় সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিনিধি' নামে একটি কবিতা চয়ন করেন। গুরু রামদাস স্বামী শিবাজীকে বললেন যে রাজপদে অভিষিক্ত হলেও রাজ্যের উপর তাঁর অধিকার থাকবে না, জনকল্যাণের জন্যই তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আসলে রবীন্দ্রনাথ স্বৈরচারি শাসনের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

তিলক মুক্তিলাভ করার পর সমগ্র দেশে তাঁর সংগ্রামী ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মহারাষ্ট্রে যে সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তা সমগ্র দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করল। বিত্তবান মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের আপোশমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বইল। জাতীয় কংগ্রেসকে সক্রিয় গণমুখী সংগঠনে শাণিত করার জন্য তিলক ইতিমধ্যেই টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠিতে (নভেম্বর ১৮৯৫) লিখলেন যে কংগ্রেসকে সচল করতে হলে গণমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। তিলকের জনপ্রিয়তা ও কর্মকুশলতা দেখে ব্রিটিশ লেখক ড. জে.টি. স্যান্তারল্যান্ড তাঁকে 'bora leader' বলে অভিনন্দিত করেন।

তিলকের নেতৃত্ব ও কর্মপন্থা জাতীয় রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটাল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিলক সক্রিয় জাতীয়তাবাদী দলের শীর্ষ নেতার আসনে উপবিষ্ঠ হলেন। ছিটেফোঁটা সংস্কার নয়, চাই স্বরাজ। তিলক জানালেন, 'স্বরাজ জন্মগত অধিকার'। শ্রী অরবিন্দ বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় তিলককে আগামী দিনের প্রতীক নামে অভিহিত করলেন। এইভাবে দেখা গেল ১৮৯৭-৯৮ সালে তিলক মহারাষ্ট্রে যে গণমুখী ও সংগ্রামী রাজনীতির সূচনা করেছিলেন তা এক দশকের মধ্যে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে রূপান্তরিত হলো। প্লেগ মহামারীর সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নির্দয় আচরণ যে গণরোষ সৃষ্টি করেছিল, তা নতুন পথের ইঙ্গিত দেয়। চাপেকর ভাইদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাঙ্গলার বিপ্লবীরা মুক্তিসাধনার জন্য আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ হলো। তিলক হয়ে উঠলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পয়লা নম্বর শত্রু। তাই ১৯০৮ সালে তাঁকে আবার রাজদ্রোহ আইনে সুদূর মান্দালয়ে ছ'বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হলো। সারা দেশে আলোড়ন হলো। বোম্বাই ও অন্যত্র শ্রমিক শ্রেণী বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়। রাশিয়া থেকে ভি.আই. লেনিন ভারতে গণআন্দোলনকে স্বাগত জানান এবং তিলককে গণ-আন্দোলনের রূপকার হিসেবে শ্রদ্ধা জানান।

(লেখক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ এবং গবেষক)

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
❖ Portfolio Management Services	❖ Retirement Planning
❖ Mutual Fund	❖ Pension Fund
❖ Life Insurance	❖ Children Education Fund
❖ General Insurance	❖ Daughter Marriage Fund
❖ Mediclaim	❖ Estate Creation
❖ Accidental Insurance	❖ Wealth Creation
❖ Company Bond & Fixed Deposit	❖ Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

ব্রিটিশ সরকার তাঁর মাথার দাম রেখেছিল সাড়ে সাত হাজার টাকা

শুক্লা সিকদার

কালজয়ী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 'সব্যসাচী' তিনি। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ। ভারতের ইতিহাস সচেতন খুদে পড়ুয়াদের কাছে তিনি সেই বিপ্লবী, প্রাণপণ চেষ্টা করেও যাকে কোনোদিন ব্রিটিশ পুলিশ স্পর্শ করতে পারেনি।

বাস্তবে তিনি ভারত পথের পথিক, ধীসম্পন্ন বাঙ্গালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বুদ্ধিদীপ্ত ব্যতিক্রমী অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক স্তরে পূর্ণতা দেওয়া নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। বস্তুত নেতাজীর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প লড়াইয়ের ভিত্তিপ্রস্তর প্রস্তুতিতে রাসবিহারী বসুর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

১৮৮৬ সালের ২৫ মে জন্ম ভারতের বাঁধনভাঙা বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর। তিনি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরের সন্নিকটস্থ পাড়েলাবিঘাটি গ্রামে তার মাতামহ নবীন চন্দ্র সিংহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন বিনোদবিহারী বসু, মাতা ছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবী এবং তিনকড়ি দাসী ছিলেন তাঁর ধাত্রী মাতা। তাঁর পিতামহ ছিলেন কালীচরণ বসু। জন্মসূত্রে দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে রাসবিহারী বসু ছিলেন অগ্রজ, ভাই বিজন বিহারী বসু ছিলেন মধ্যজ এবং বোন সুশীলা দেবী ছিলেন অনুজ। ১৮৮৯ সালে মাত্র ৩ বছর বয়সে রাসবিহারী বসু মাতৃহারা হলে তার প্রয়াতা মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর কাকিমা ভামাসুন্দরী দেবী ও দাদামশাই কালীচরণ বসুর তত্ত্বাবধানে হুগলি জেলার সদর চন্দননগরে তার শৈশব ও বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়।

স্কুল জীবন থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে আগ্রহী হয়ে পড়েন রাসবিহারী বসু।

স্বনামধন্য বাঙ্গালি সাহিত্যিক, কবি তথা জাতীয়তাবাদী দার্শনিক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসটি

রাসবিহারীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এছাড়া কবি নবীন সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' এবং তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্বালাময়ী ভাষণ রাসবিহারী বসুর মনে দেশভক্তির উদ্রেক ঘটিয়েছিল। বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী তরুণ বিপ্লবীর মনে অগ্নি সঞ্চার করেছিল। তার ওপর চন্দননগরে থাকাকালীন শিক্ষক চারুচাঁদ মহাশয়ের চরমপন্থী বৈপ্লবিক মনোভাবও রাসবিহারী বসুকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছিল।

পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী প্রবল পরাক্রমী ইংরেজদের বিরুদ্ধে দিল্লি ষড়যন্ত্র, বেনারস ষড়যন্ত্র এবং লাহোরের গদর ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার মূলে ছিলেন তিনি। ১৯০৮ সালে আলিপুরে বোমা মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি বাঙ্গলা ত্যাগ করতে একরকম বাধ্য হন। ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর যে হামলা হয়, হার্ডিঞ্জের প্রণনাশের জন্য কৃত সেই হামলার পকিল্পক ছিলেন রাসবিহারী বসু। ওই ঘটনার পর তিনি ঘটনাস্থল দিল্লি থেকে আত্মগোপন করে দেরাদুনে গিয়ে ব্রিটিশদের বাধ্য কর্মচারীর মতো দপ্তরের কাজে যোগ দেন। দেরাদুনে তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জের উপরে অকস্মাৎ হামলার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ অনুরাগীদের নিয়ে নাগরিক প্রতিবাদ সভারও আয়োজন করেন। রাসবিহারী বসুর এই প্রখর বুদ্ধিদিপ্ত ক্রিয়াশীলতাই তাকে তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ব্রিটিশদের কাছে অধরা করে রেখেছিল। পরবর্তীকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ তার লেখা বই 'My Indian years, 1910-1916'-এ অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে লিখেছিলেন, 'One who on earth can imagine that he (Bose) was the same person who had masterminded & excuted the most outstanding revolutionary action.'

রাসবিহারী বসুর ছদ্মবেশের আড়ালে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে পুরো ব্রিটিশ সরকার এতোটাই নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছিল যে সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার তার মাথার মূল্য ৭৫০০ টাকা ঘোষণা করেছিল। তখন ব্রিটিশ প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে জাপানে গিয়ে আত্মগোপন করেন রাসবিহারী বসু। জাপানে অবস্থানকালে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই রাসবিহারী বসু বিয়ে করেন জাপানে তার আশ্রয়দাতা জাপানি সোমা পরিবারের কন্যা তোশিকো সোমাকে। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তোশিকো সোমার দুটি সন্তান ছিল। তাদের দুই সন্তানের নাম হলো তেৎসুকো হিগুচি বসু ও মাশাহিদে বসু যার (ভারতীয় নাম ভারতচন্দ্র)। মা শাহিদের জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট ও তেৎসুকোর জন্ম ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মাত্র ২৪ বছর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে মাশাহিদের মৃত্যু ঘটে।

রাসবিহারী বসুকে জাপানে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকাকালীন আশ্রয় দিয়েছিল সোমা পরিবার। জাপানের সোমা পরিবারের অনুকূল্যে নির্বাসনে থাকাকালীন এক সময়ে সোমা পরিবারের পরিচালিত জনপ্রিয় 'নাকামুরায়া বেকারি'তে কাজ করতেন তিনি। তাঁর হাতেই সৃষ্টি হয় ভারতীয় ও জাপানি রান্নার মিশেলে আজকের বিখ্যাত 'নাকামুরায়া কারি'। সোমা পরিবার এবং আরও অনেক জাপানি ব্যক্তিত্বের আন্তরিক সহযোগিতায় ১৯২৩ সালে তিনি জাপানি নাগরিকত্ব লাভ করেন, যা তার ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাত্রায় কিছুটা স্থিরতা এনেছিল।

সরসঙ্ঘচালকের ভাবনা বিজ্ঞানসম্মত বলেই গ্রহণযোগ্য

বিমল শংকর নন্দ

গত ৪ জুলাই ২০২১ তারিখে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় শ্রী মোহন ভাগবতের কিছু বক্তব্য এদেশের সর্বস্তরে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। শ্রী ভাগবতের কথাগুলিকে কেবল বক্তব্য না ধরে এগুলিকে সুনির্দিষ্ট ভাবনার প্রতিফলন বলা যেতে পারে। কারণ এর মধ্যে রয়েছে অনেক প্রশ্নের উত্তর, অনেক নতুন ভাবনার ইঙ্গিত। দীর্ঘদিন ধরে তথাকথিত বাম-উদার বুদ্ধিজীবীকুল এদেশের সমাজ রাজনীতি, বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে যে সমস্ত ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন তার বিকল্প চিন্তার অনেক রসদ আছে শ্রী মোহন ভাগবতের এই ভাবনাগুলিতে। এই ভাবনাগুলির প্রভাব এমনই যে যারা তাদের চিরাচরিত মত নিয়ে এর সমালোচনা করছেন তাঁরাও এই ভাবনার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারছেন না।

ঠিক কী বলেছেন শ্রী মোহন ভাগবত? গত ৪ জুলাই গাজীয়াবাদের মেবার ইন্সটিটিউটে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ আয়োজিত অনুষ্ঠানের থিম ছিল 'Hindustani First, Hindustan First'। এই অনুষ্ঠানে খাজা ইফতিকার আহমেদ লিখিত একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় যার নাম— দ্য মিটিং অব মাইন্ডস : এ ব্রিজিং ইনিশিয়েটিভ। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী মোহন ভাগবত বলেন যে সকল ভারতীয়ের ডিএনএ এক এবং ধর্মাচরণের ভিত্তিতে তাদের আলাদা করা যাবে না। তাঁর মতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ধারণাটিই বিভ্রান্তিকর কারণ এদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই এবং তাই তাদের ঐক্যবদ্ধ করার কিছু নেই। তিনি আরও বলেন, 'হিন্দু বা মুসলমানের আধিপত্য বলে কিছু হয় না। আধিপত্য থাকবে কেবল ভারতীয়দের'। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু মানুষকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে তাঁর বক্তব্য হলো, এই ধরনের হিংসার ঘটনা হিন্দুত্বের বিরোধী। এ প্রসঙ্গে তিনি অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বহু ক্ষেত্রেই পিটিয়ে মারার মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে অনেকের বিরুদ্ধে। শ্রী ভাগবতের ভাষায়— 'যদি কোনো হিন্দু বলে যে কোনো মুসলমান এদেশে অর্থাৎ ভারতে থাকতে পারবে না তাহলে সে হিন্দুই নয়। গোরু একটি পবিত্র প্রাণী কিন্তু এর নামে যারা মানুষকে পিটিয়ে মারে তারা হিন্দুত্বের বিরুদ্ধেই যায়। এসব ক্ষেত্রে আইনকে তার নিজের পথে চলতে দেওয়া উচিত এবং কোনো পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তাঁর অনুরোধ তাঁরা যেন ভারতে ইসলাম বিপন্ন এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত না হন। তাঁর কথায়, 'এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে আমরা গত চল্লিশ হাজার বছর ধরে একই পূর্বপুরুষের সন্তান। সব ভারতীয়ের একই ডিএনএ'। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো— রাজনীতি ঐক্যসাধনের কোনো উপায় হতে পারে না। বিপরীতপক্ষে রাজনীতি হয়ে উঠেছে ঐক্য বিনষ্ট করার একটি অস্ত্র। তাঁর মতে ঐক্যের ভিত্তি হতে পারে জাতীয়তাবাদ, পূর্বপুরুষদের উজ্জ্বল ঐতিহ্য।

মোহন ভাগবত ভারতীয় সমাজের, হিন্দুধর্মের, হিন্দুত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। কারণ এই ভাবনা বিজ্ঞানভিত্তিক।

বাম-উদারবাদী ভাবনায় ভারতীয় সমাজের চরিত্র সম্পর্কে যে ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে তাতে প্রকৃত সত্যটাকে লুকিয়ে রেখে এক বিকৃত সত্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে বার বার। তাঁদের লক্ষ্য একটাই। ভারতীয় সমাজের বৈচিত্র্য এবং বিবিধতাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে এটা প্রমাণ করা যে ঐক্য নয়, বৈচিত্র্যই ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঐক্য একটি আরোপিত ধারণা মাত্র। তাঁরা হিন্দু সমাজকে দেখতে চান জাতপাতের আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে। এর কোনো বিকল্প ব্যাখ্যা তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যুগের পর যুগ ধরে এই দেশে নানা বৈচিত্র্য এবং বিবিধতার মধ্যেও ঐক্যের যে শক্তিশালী ভাবনা গোটা দেশকে এক করে রেখেছে তাঁকে এই বাম-উদারবাদীরা খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁদের কাছে হিন্দুত্বের কোনো ঐক্যসাধনকারী শক্তিই নেই। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য ভারতীয় জনগোষ্ঠী তাদের জীবনধারা, আচার আচরণ প্রভৃতির মধ্যে হিন্দুত্বের যে ভাবনাগুলিকে বহন করে চলেছে এই ঐতিহাসিকরা তার বাস্তবতা নিয়েও বার বার প্রশ্ন তোলেন। লক্ষ্য এদের একটাই, একদিকে হিন্দুত্বকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে হিন্দুধর্মকে অতি দুর্বল একটি ধর্ম বলে চিহ্নিত করা অন্যদিকে বহু জনগোষ্ঠীকে হিন্দু ধর্মের বাইরে বার করে দেওয়া যাতে হিন্দু ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে হিন্দুত্বের দর্শন। স্বাধীনতার আগে বিভিন্ন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত ও লালিত-পালিত এই বাম-উদারবাদী ঐতিহাসিককূল স্বাধীনতার পরে দশকের পর দশক ভারতীয় ইতিহাসচর্চাকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে

কেন্দ্রের শাসকদল কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মদতে। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানই এদের নিয়ন্ত্রণে। দীর্ঘদিন ধরে এরাই ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার পাঠ্যসূচি তৈরি করেছেন বা পাঠ্যসূচি তৈরির প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছেন। বিগত দুটি দশক ধরে এদের চাপিয়ে দেওয়া চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করে যখন বিকল্প ভাবনা উঠে আসছে, ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে, সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে তখন আবার গেল গেল রব তুলে তাকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে এদেশের ৫৩ জন বাম উদারবাদী ইতিহাসবিদ (এদের মধ্যে ছিলেন রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিবের মতো পরিচিত বামপন্থীরা) এক বিবৃতিতে তাদের ভাষায় 'দেশে বিভিন্ন ধরনের অসহিষ্ণুতার কারণে বিষিয়ে ওঠা সামাজিক পরিবেশের' ব্যাপারে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। তাঁদের আরও অভিযোগ ছিল ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব নাকি বিকৃত ইতিহাসচর্চায় মদত দিচ্ছেন। তাদের ভাষায়, 'What is the regime seems to want is a kind of legislated history, a manufactured image of the past, glorifying certain aspects of it and denigrating others, without any regard for chronology sources or methods of enquiry...'

সত্যই কি তাই? এই বিবৃতি প্রকাশের কিছুদিন পরে এদেশের ৩৭ জন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও গবেষক তাঁদের পালটা বিবৃতিতে বাম-উদারবাদী ঐতিহাসিকদের প্রতিটি যুক্তি খণ্ডন করেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। এঁদের মতে বামপন্থীদের অভিযোগে ঐতিহাসিকতার চেয়ে রাজনীতি এবং তাঁদের মতাদর্শ অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এই ৫৩ জন বাম-উদারবাদী ইতিহাসবিদ তাঁদের বিবৃতি প্রকাশ করার পরই ভারতের বাইরে থেকে ১৭৬ জন ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী তাঁদের খোলা চিঠিতে ভারতের বর্তমান সামাজিক অবস্থাকে '...a dangerously pervasive atmosphere of narrowness, intolerance and bigotry' বলে চিহ্নিত করেন। এদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে নাকি 'a monolithic and flattered view of India's history' গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। দেশ ও বিদেশের বাম উদারবাদীদের এই সম্মিলিত কোরাসের মধ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসলে এরা সম্মিলিতভাবে নতুন ভাবনা এবং ব্যাখ্যার উত্থানকে আটকাতে চান। বাম উদারবাদী ঐতিহাসিকদের ভণ্ডামীকে সবার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়ে ৩৭ জন ঐতিহাসিক ও গবেষক এদের দৃষ্টিভঙ্গির দীনতাকে তুলে ধরেন। এঁদের মতে বাম ঐতিহাসিকরা ভারতীয় সমাজকে বিচার করেন জাতপাতের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তাঁদের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজের ঐক্যসাধনকারী শক্তিগুলোর কোনো গুরুত্বই নেই। তাহলে ভারতীয় সমাজ এতদিন টিকে আছে কী করে? এর কোনো উত্তর এঁরা দেন না। দর্শন, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রযুক্তিবিদ্যা-সহ অন্যান্য সংস্কৃতি এবং সভ্যতায় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে এঁরা কখনোই তুলে ধরেন না। ভারতীয় সভ্যতাকে ছোটো করে দেখানোর ব্যাপারে এঁরা ঔপনবেশিক ইতিহাসবিদদের একনিষ্ঠ অনুগামী। ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সংস্কৃতির মৌলিকতা এবং ধারাবাহিকতা এঁদের চোখে পড়ে না। ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ বিশেষ করে অত্যাচারী মুসলমান শাসকদের বিভীষিকাময় কার্যকলাপকে এঁরা সযত্নে লুকিয়ে রাখেন। এঁরা চান এঁরা যেভাবে ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা দেবেন সবাই সেটাই জানবে। বিভিন্ন ভাবনার উত্থান ঘটলেই তাকে সাম্প্রদায়িক, উগ্রজাতীয়তাবাদী বলে চিহ্নিত করে তাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে যে কোনো আলোচনায় এবং তাত্ত্বিক চর্চায়। হিন্দু এবং মুসলমানদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর মধ্যে এই ভাবনারই প্রতিফলন ঘটে। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে ইসলাম বাইরে থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল আক্রমণ ও দখলের নীতি নিয়ে। আর এদেশে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দ্বাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক —এই দীর্ঘ দু' শতাব্দী সময়কালে এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে নানা আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে। অল্প কিছু বাদ দিলে ভারতের মুসলমানরা ভারতেরই আদি বাসিন্দা। তাই হিন্দু মুসলমানদের ডিএনএ এক —এই কথাটির মধ্যে ভুল কিছু নেই। বরং বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিকভাবে তা সত্য। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু প্রভৃতি ধারণা। পৃথকীকরণের ধারণা সংখ্যালঘুদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলে, তাদের মধ্যে অসহায়তার মনোভাব জাগিয়ে রাখতে পারলে ভোটের বাক্সে তাদের সমর্থন পাওয়া সহজ। বাম উদারবাদীরা তাত্ত্বিকভাবে সেটাই করে এসেছেন। এর রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছে বামদলগুলি এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনেও এই নীতির প্রয়োগ দেখা গেছে যদিও তার সুবিধা বাম দলগুলি কিংবা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পায়নি। পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

শ্রী মোহন ভাগবতের ভাবনা এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদের মূলে গিয়ে আঘাত করেছে। তাই এই সত্যিটাকে মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কখনো শশী থারুর-এর Why I Am a Hindu, কখনো কাঞ্চা ইলাইয়া শেফার্ড-এর Why I Am Not a Hindu বইগুলোর উদাহরণ ও বক্তব্য টেনে হিন্দুধর্মের আলোচনাকে সেই জাতপাতের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আগলে রাখার অপচেষ্টা চলছে আগের মতোই। কিন্তু শ্রী মোহন ভাগবত ভারতীয় সমাজের, হিন্দুধর্মের, হিন্দুত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। কারণ এই ভাবনা বিজ্ঞানভিত্তিক। তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যৌক্তিক নীতির ভিত্তিতে। একারণেই তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং গবেষক)

জাতীয় ঐক্যের বিরোধিতায় তোষণ রাজনীতির কুশীলবেরা

নিখিল চিত্রকর

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহন ভাগবত গাজিয়াবাদে যেদিন বলেন, ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের ডিএনএ একই, তাঁর মন্তব্যের বিরোধিতায় পথে নেমে পড়ল কমিউনিস্ট- কংগ্রেসের তাত্ত্বিক নেতারা। নেহরু-মার্কস আওড়ানো বিরোধীরা একটু তলিয়ে ভাবলেন না, ভাগবতজীর মন্তব্যের গূঢ় অর্থ। ভারতের হিন্দু-মুসলমানের উৎস যে অভিন্ন ও তার ভিত্তি যে সাম্প্রদায়িক নয় সম্প্রীতির, এই দর্শনকেই চিরকাল সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে সঙ্ঘের তরফে।

একথা অনস্বীকার্য, ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতে মুসলমান ছিল না। যারা তারপর মুসলমান হয়েছেন তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এখন তাঁদের উপাস্য আলাদা হলেও জাতিগত পরিচয়ে তাঁরা হিন্দু। এই সত্য আসলে ভারতের জাতীয় ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি সৎ লক্ষ্য। এ নিয়ে কোনও রাজনীতি বাঞ্ছনীয় ছিল না।

ভাগবতজীর মন্তব্যটিকে রাজনীতির আখড়ায় এনে কুস্তির আবহ তৈরিতে সচেষ্ট বিরোধীরা আসলে সম্প্রীতি নয় সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রাখতে চয়। যে কারণে স্বাধীনতার পঁচাত্তরতম বর্ষপূর্তির লগ্নে এসেও ভারতের জাতীয় ঐক্য খানিকটা বিচ্ছিন্ন। একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে কমিউনিস্ট, এই দুটি দল পরিকল্পিত বিভাজন নীতি প্রয়োগ করে ভারতীয়দের সর্বদা ঐক্যের লক্ষ্য থেকে দূরে রেখেছে।

কমিউনিস্ট শাসনে কেরলে যেভাবে সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রাধান্য দিয়ে, হিন্দুদের চাপের মধ্যে রাখা হচ্ছে, হিন্দুদের বিপর্যস্ত করা হচ্ছে, একই ছবি দেখা যেত এই বাঙ্গলায় বাম শাসনের আমলে। এভাবে এক সম্প্রদায়কে কাছে টেনে নিয়ে অন্যের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরির ফর্মূলা বামেদের চিরন্তন খেলা।

১৯৭৯ সালে সরস্বতী পুজোর দিন জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সুন্দরবন অঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থীদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছিল। এই শরণার্থীদের বেশিরভাগই ছিল দলিত, যারা বাংলাদেশে মুসলমানদের নিপীড়ন থেকে প্রাণে বাঁচতে ভারতে আশ্রয় চেয়েছিল। তারা ছিল সংখ্যায় প্রায় ষাট হাজার।

১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিলের বিজন সেতুতে আনন্দমার্গীদের হত্যার নারকীয়তাও ভোলার নয়। সেদিন আনন্দমার্গের দুই মহিলা সন্ন্যাসী-সহ ৯৭ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল সিপিআইএমের ক্যাডাররা। দুটি হত্যাকাণ্ডেই হিন্দুরা ছিল কমিউনিস্টদের শিকার। আর মুসলমানরা লাল পার্টির তোষণ রাজনীতির ক্রীড়নক মাত্র। সবক্ষেত্রেই কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট একে অপরের দোসর।

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি মানে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। এদের নিজস্বতা বলে কিছু নেই। চীনের চেয়ারম্যান এদের চেয়ারম্যান। চীনের পার্টিলাইন মেনেই লাল পার্টির নেতারা দলের যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করে থাকেন। এরকম একটি পরজীবী, পরগাছা রাজনৈতিক দল যে দেশ ও জাতির পক্ষে কতটা ক্ষতিকর তা দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন বাংলার মানুষ। আজ ওরা শূন্যপ্রায়। তবুও কমিউনিজমের ভাইরাস সমাজের নীচুতলার জিনে এখনো বাসা বেঁধে রয়েছে। কারণ দারিদ্র্য ও শ্রেণী বৈষম্যের তাস ওদের

আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখার মূল জীবনীশক্তি। তথাকথিত সেকুলার মনোভাবাপন্ন উঠতি নেতারা এদের বাহক।

এই কারণেই এখনো চীনের পিপিসির একশো বছরের পূর্তিতে এদেশের কমিউনিস্টরা সগর্বে অংশগ্রহণ করে দেশদ্রোহের আবহে গা ভাসাতে দ্বিধাবোধ করে না। ভারত-চীন সংঘর্ষে চীনারা ভারতীয় সেনাকে নৃশংসভাবে খুন করলেও এদেশের কমিউনিস্টরা নীরব থাকে। তাদের নীরবতা আদতে জিনপিংদের প্রতি সম্মতির লক্ষণ।

এত কিছুর পরেও কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা ভারতের জাতীয় ঐক্যকে ভাঙতে পারেনি। সময়ে সময়ে দেশবাসীর জাতীয় আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছিল মাত্র। কিন্তু আজ ভারতের মসনদে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ভারতের জাতীয় সংহতি রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান।

পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদের দর্শনকে পাথেয় করে বর্তমান কেন্দ্র সরকার যে, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের ডাক দিয়েছে, তা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অভিনব। ভারতের দর্শনগুলির মধ্যে অদ্বৈতবাদ দর্শনই হলো একাত্ম মানব দর্শনের ভিত্তি। এভাবেই আজ বৈচিত্র্যগুলো একসূত্রে গেঁথে ভারতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টিম নরেন্দ্রমোদীর নেতৃত্বাধীন আমাদের ভারত।

অপরাধ কমাতে সুশিক্ষা দেওয়ার ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের বক্তৃতার অংশবিশেষ নিয়ে তুমুল প্রতিক্রিয়া হচ্ছে হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যেই। পুরোটা না শুনে শুধু বিশেষ বিশেষ অংশ ও তাই নিয়ে সংবাদ শিরোনাম দেখে অতখানি উদারতা ঠিক আমারও পরিপাক হয়নি; বিশেষ করে তার পরবর্তী ''মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম.....'' পোস্ট দেখে, যেটা ব্যাঙ্গার্থে করা হয়নি, হয়েছে 'দলের গা থেকে সাম্প্রদায়িক তকমা দূর করতে, কিংবা নিছক আনুগত্যের কারণে'।

কিন্তু কিছু সঙ্ঘ সমর্থক তাঁর কথাগুলো যুক্তি দিয়ে বোঝানোর পরিবর্তে খেপে যাওয়া হিন্দুত্ববাদীদের আরবান নকশাল বলে আক্রমণ করে বিক্ষুব্ধদের বিজেপির সমর্থক হওয়ার, এমনকি দলটিকে ভোট দেওয়ার অধিকারটুকু পর্যন্ত হরণ করতে চায় যেন। সেটা করার এক্তিয়ার তাদের নেই। কিন্তু যেভাবে জনৈক সঙ্ঘ সমর্থক বা স্বয়ংসেবক আক্রমণ শানিয়েছে, তাতে ওই ব্যক্তি সম্বোধিত 'ভিরাট হিন্দু' বা 'ঝটকা হিন্দু'দের অনেকেই রাগ করে ভারতের হিন্দু স্বার্থ দেখা একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলটির হিন্দু ভোট ব্যাংকে সত্যিই ধস নামাতে পারে।

মোহনজীর সাফাই গেয়ে আমার কোনও লাভ নেই। নিজে কোনও দল, কোনও সংগঠন কোনও ব্যক্তিবিশেষের অন্ধ অনুগামী নই। শুধু তাঁর কয়েকটি কথা একটু যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি।

প্রথমত : এই দেশের মূলনিবাসীর ঘরে জন্মানো মানুষটাকে যদি কোনও জঙ্গি মতবাদের ছত্রছায়ায় জোর করে আনা হয়, তাহলে কিন্তু তার পূর্বসূরীদের সঙ্গে জেনেটিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় না। যদি তার বোন বা মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে আগ্রাসক সম্প্রদায়ের দাসী বা বাচ্চা পয়দা করার যন্ত্রে রূপান্তরিত করা হয়, তাহলেও সেই ধর্মান্তরিত মেয়েটি ও তার সন্তান হিন্দু বাড়ির ডিএনএ বহন করবে। কাল যদি কেউ আপনার মেয়েকে অপহরণ করে, তাহলে কি জৈবিকভাবে সেই হতভাগিনী আপনার মেয়ে থাকবে না? আপনি অস্বীকার করে ত্যাজ্য করলে শত্রুপক্ষের লাভ। মেয়েটি তাদের হাতছাড়া হয়ে নিজের সম্প্রদায়ে ফিরে আসতে পারবে না। আরব তুরস্ক পারস্য বা মোঙ্গলিয়া থেকে আসা মুসলিমদের কথা বাদ দিলে ভারতীয় মুসলমানরা নৃতাত্ত্বিক বিচারে কোনও না কোনও প্রকার ভারতীয় জিনই বহন করে।

অপরাধ হলে তো আইন দেখবেই। আত্মরক্ষার জন্য দরকারে মানুষ আইন ভাঙতেও পারে। কিন্তু অপরাধ কমানোর জন্য সুশিক্ষা দেওয়ার ধারাবাহিকতা বন্ধ করা হবে কেন?

কিন্তু একটি ভ্রান্ত সর্বগ্রাসী মতবাদের সৌজন্যে তারা সে কথা অস্বীকার করে নিজের দেশবাসী জ্ঞাতিগুষ্টির সঙ্গেও শত্রুতা শুরু করে দেয়। আসলে মগজ ধোলাইয়ের ফলে শত্রুতা হিংস্রতা নোংরামোর অজুহাত খুঁজতেই নিজেদের শিকড়কে অস্বীকার করে। তাদের তো প্রতি মুহূর্তেই মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, তারা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের পুণ্যভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে আসেনি, এই দেশের মাটিতে জন্মে এই দেশের সঙ্গেই বেইমানি করছে। তাদের ভাই (বোনদের বিষয়টা অন্য, তারা পুরুষদের দ্বারাই চালিত হয়) ভাবার, এক বৃন্তে অপর কুসুম ভাবার কোনও কারণই নেই। চোখে ঠুলি ও মনে বিষাক্ত গোঁয়ার্তুমি ছাড়া বা প্রচণ্ড আত্মসর্বস্বতা ছাড়া সবাই জানে, পানীয় জল ও নর্দমার জল এক পাত্রে রাখা যায় না, ঘরে আগুন লাগলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু এত কিছুর পরেও কেউ মানুক বা না মানুক, নৃতাত্ত্বিক সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। লেখক সীতারাম গোয়েল তাঁর 'HINDU SOCIETY UNDER SIEGE' গ্রন্থে লিখেছেন, ''Let it be clear that the reference here is not at all to our Muslim brethren who are our own flesh and blood, except for the microscopic minority which thakes pride in the purity of its Arab, Persian or Turkish descent. Instead of being the proponents of Islamism, the Muslims of India are its victims whom it is trying to use as vehicles of its poisonous virulence. The vast majority of Indian Muslims were converted to Islam by force or allurements.'' অর্থাৎ বিশুদ্ধ আরবি, ফারসি বা তুর্কি বংশোদ্ভূত বলে গর্ব করা

আণুবীক্ষণিক মুষ্টিমেয় মুসলিম ছাড়া আমাদের বাকি মুসলিম ভাইদের শরীরে আমাদেরই রক্ত মাংস। সেই ভারতীয় মুসলিমরা ইসলামের প্রবক্তা হওয়ার বদলে তার নিছক শিকার হয়ে বিষাক্ত উগ্রতা ছড়ানোর মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতীয় মুসলিমদের বিশাল অংশ হয় ছলে বলে নয় কৌশলে প্রলোভনের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই ধর্মান্তরকরণ তাদের সামাজিক বা সাংস্কৃতিকভাবে কোনও উন্নতি সাধন করেনি, যার প্রমাণ ভারতের মুসলিম সমাজের দিকে তাকালেই পাওয়া যায়। ভারতীয় মুসলিমদের তাই ইসলামের দোষগুলো বহন করার পরিবর্তে তার থেকে মুক্তি পেতে হবে। তিনি ইসলামের যাবতীয় কুকীর্তি ফাঁস ও তুলোধোনা করেও অভিন্ন পূর্বসূরির সত্য একাধিকবার স্বীকার করেছেন এবং সেখান থেকে ভারতীয় মুসলিমদের মুক্তিদানের কথাও ভেবেছেন।

আমি একটি উদাহরণ দিই, একজন মণিপুরী হিন্দুর চেয়ে একজন বাংলভাষী মুসলমান যে জেনেটিক উপাদানে বাঙ্গালি হিন্দুর অনেক বেশি কাছাকাছি, তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারতীয় মুসলমান সমাজকে সেটা বারবার মনে করানো দরকার, অবশ্যই তাদের ভ্রান্ত আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সচেতন থেকেই। মোহন ভাগবতের বক্তৃতায় দুষ্কৃতীদের প্রতি ভর্ৎসনা ও সতর্ক করে দেওয়ার ঝাঁজ থাকলে এই একই কথাগুলোতে একাত্ম মানবতাবাদের অনুসারী, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক থেকে নব্য হিন্দুত্ববাদীদের কারও ক্ষোভ থাকত না। কিন্তু যে জায়গায় গিয়ে তিনি বক্তব্য রেখেছেন, সেখানে কি প্রবীণ তোগড়িয়ার ভাষায় কথা বলা যেত, নাকি সেটা বিচক্ষণতা হত?

দ্বিতীয়ত : মোহনজীর বক্তব্য, শুধু যারা মাথায় তিলক আর গলায় মালা পরে, তারাই হিন্দু নয়; হিন্দুভূমি ভারতবর্ষে যারা জন্মেছে, তারা সবাই হিন্দু। উনি 'হিন্দু' শব্দটির ব্যাপ্তি অনেক ব্যাপক করে ধরেছেন। আমি সংকীর্ণ করেও প্রশ্ন রাখছি : সব হিন্দুই কি কপালে তিলক আঁকে? এখনকার হিন্দু স্বার্থে কথা বলা, কাজ করা কতজন নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি কপালে তিলক কাটেন? কিন্তু তাই বলে কি তারা হিন্দু নন? তাহলে প্রবীণজীর কেন মনে হল, মালা তিলকের অপমান করা হয়েছে? তাঁর অনুগামীদের মধ্যেই বা কজন এই প্রসাধন বিধি মেনে চলে যদি আপামর জনসাধারণের মধ্যে চলে যাই?

এই সময়েই (জুলাই ২০২১) তো হরিদ্বারে তিন দিন ব্যাপী ধর্ম সম্মেলন হয়ে গেল, যেখানে জেহাদি আগ্রাসনের শিকার হিন্দু ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধি এমনকি নাস্তিকদেরও ডাকা হয়েছে। তাদের কতজন মালা তিলক পরে এসেছিলেনন? সেখানে তো হিন্দু নাস্তিকরাও যোগদান করেছেন। অনুরূপ বার্তা এক বছর আগে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে কিছুটা বিশদে আমার **'সাম্প্রদায়িক একাত্মতা'** রচনাটিতে ছিল। কিছু স্বার্থান্বেষী কিন্তু সেখান থেকে অংশবিশেষ তুলে নিয়ে অপপ্রচার করেছিল এবং এমন মানুষকেও ভুল বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যারা প্রথমে রচনাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন উদ্দেশ্য ছিল একটি হিন্দু সংগঠনকে বদনাম করা, বিপাকে ফেলা; বর্তমানে উদ্দেশ্য হল সঙ্ঘের বিরোধিতা করা। দু' ক্ষেত্রেই ফলাফল হিন্দু ঐক্যে ফাটল বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হওয়া, মেরামতির বাইরে চলে যাওয়া।

তৃতীয়ত : গোহত্যার জন্য গণপ্রহারের নিন্দা নিয়েও আপত্তি উঠেছে। আমার মতে শুধু গোহত্যা নয়, নিষ্ঠুরভাবে জবাই করাটাই আইন করে বন্ধ হোক। তবে এ দেশের যেসব হিন্দুত্ববাদীকে দিনের পর দিন হিন্দু নারী শিশুর ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার জন্য ফেসবুকে দু'চার কলম লেখা ও 'বেশ হয়েছে' বলে নির্যাতিতাকেই দোষারোপ করে নিজেদের কর্তব্য সমাধা করতে দেখা যায় তারাই গোহত্যার জন্য লিপ্তিত-এ বেশ উৎফুল্ল হন। এই ছবিটা ১৯৪৬-এ ছিল না। তখন মেয়েদের সঙ্গে অভব্যতা হচ্ছে, এই উড়ে আসা খবরটুকুই হিন্দু ছেলেদের তাতানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কলকাতা দাঙ্গায় অপহৃত একটি হিন্দু মেয়েকে উদ্ধারের দাবি নিয়ে বিহারের মুঙ্গেরে নিজেদের শক্তি ও আত্মসম্মানের পরীক্ষা দিয়েছিল হিন্দুরা। গোমাতা রক্ষা জরুরি, কিন্তু নিজেদের মাতৃজাতিকে রক্ষার অগ্রধিকার ভুললে প্রজাতি টিকবে? মোনহজী এই মর্মে কিছু বলেননি। তাই এই নিয়ে আমিও কোনও ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না।

এখন যাদের মস্তিষ্ক একটি অসহিষ্ণু মতবাদের দ্বারা ছলে বলে কৌশলে যে প্রকারেই হোক একবার প্রক্ষালিত হয়, তাদের সেই ভুলের স্বর্গ থেকে মুক্ত করা বা তাঁদের লাগাতার হিংস্রতার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা বাস্তবিকই অসম্ভবের কাছাকাছি। মোহন ভাগবতের বক্তব্যের পরেই আসাদুদ্দিন ওয়েসি হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর পরিচিত আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে মিথ্যা অভিযোগ এনে নিজেদের মনোভাব বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই সঙ্ঘাধ্যক্ষের কথায় হিন্দুদের অসহিষ্ণু হয়ে পড়া স্বাভাবিক। সঙ্গে এটাও বোঝা দরকার, সব সত্য সব জায়গাতে বলা যায় না; ভারতীয় রাজনীতির শর্ত মেনে মুখে অনেক কিছুই বলতে হয়, যার সবটা মনের কথা নয়। তাছাড়া সঙ্ঘেরই মুসলিম প্রকোষ্ঠ আছে। তার সদস্যরা ভিন দেশ থেকে আসেনি। তাদের মধ্যে যদি কিঞ্চিত দেশাত্মবোধ সঞ্চার করা গিয়ে থাকে, সেটা গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া কি বিচক্ষণতা?

ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বিপুল। তাদের অপসারণ করা যখন কোনও বাস্তবোচিত চিন্তা নয়, তখন তাদের বৈজ্ঞানিক নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সত্যটা সর্বক্ষণ মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। তবে তার অভিমুখ যাতে লাভ জিহাদের পৃষ্ঠপোষকতা না করে ফেলে, সেই সতর্কতা রাখতে হবে। অপরাধ হলে তো আইন দেখবেই। আত্মরক্ষার জন্য দরকারে মানুষ আইন ভাঙতেও পারে। কিন্তু অপরাধ কমানোর জন্য সুশিক্ষা দেওয়ার ধারাবাহিকতা বন্ধ করা হবে কেন? এদেশের এখনও পর্যন্ত সংখ্যাগুরু কিন্তু বিপন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সন্ধি প্রস্তাব দেওয়া ও আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া---দুটোরই প্রয়োজন আছে।

(লেখক বিশিষ্ট গবেষক এবং প্রাবন্ধিক)

তালিবানের প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে জঙ্গিগোষ্ঠীদের আরো উৎসাহ জোগাবে

রঞ্জন কুমার দে

দুই দশক পেরিয়ে আফগানিস্তানে আবার তালিবানি পদধ্বনি নিশ্চিত কায়েম হতে চলছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো-বাইডেনের ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন বাহিনী অপসারণের সিদ্ধান্তে তালিবানরা এতোটাই উজ্জীবিত হয়ে পড়েছে যে মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে তারা দেশটির ৮৫ শতাংশ এলাকা কব্জা করে নিয়েছে। তালিবানদের এই প্রত্যাবর্তনে সবচেয়ে আশঙ্কিত এবং অখুশি দেশটির সাধারণ জনগণ। তালিবান শাসনে তাদের গবাদি পশুর মতো দিন অতিবাহিত করতে হতো, প্রাক-ইসলামিক পশতুন আদিবাসী রীতি ও সৌদি মাদ্রাসার পৃষ্টপোষকতায় ওয়াহাবি ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত তালিবানি আইনে পুরুষদের দাড়ি রাখা ও মহিলাদের হিজাব পরিধান বাধ্যতামূলক। প্রতিবন্ধকতা ছিল টেলিভিশন দেখায়, গান শোনায় এবং সিনেমায়, ১০ বছর বয়সী মেয়েদের পড়াশোনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল তালিবানি সেই সরকার। সামান্য চুরির অপরাধে ঘোষিত হতো মৃত্যুদণ্ড। ২০০১ সালে তালিবান মার্কিন সংঘর্ষের গোলা-বারুদে জঙ্গিদের সঙ্গে কয়েকলক্ষ আফগানি সাধারণ জনতাকে জীবন দিতে হয়, তারা অনেকে হয়ে যায় বাস্তুহারা এবং প্রতিবেশী দেশের রিফিউজি।

১৯৯৬ সালে তালিবানরা প্রথমে আফগানিস্তান শাসনে পদার্পণ করেই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নজিবুল্লাকে প্রকাশ্যে ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়, পরের শাসন ব্যবস্থার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তাদের এই সুখ ক্ষণস্থায়ী ছিল, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে আল-কায়দা জঙ্গি আক্রমণ করলে মার্কিন প্রশাসন তালিবানকে আফগানিস্তানে আশ্রয় নেওয়া দোষী আল- কায়দাদের তাঁদের হাতে তুলে দিতে আহ্বান জানায় কিন্তু তালিবান সেটা অস্বীকার করায় খুব শীঘ্রই মার্কিন-ন্যাটো যৌথ সামরিক আক্রমণে খুব শীঘ্রই তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, এই ৫ বৎসরের তালিবান সরকারের শুধু পাকিস্তান, ইরান এবং সৌদি সরকারের স্বীকৃতি ছিলো। মার্কিন-ন্যাটোর উপস্থিতিতে আফগান সরকারের আমলে মানুষ তুলনামূলক সুখী থাকলেও দীর্ঘ দু-দশকে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। স্থানীয় তালিবানরা ক্রমশ সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে সচেষ্ট থাকে। পাকিস্তান, ইরান পরাজয়ী তালিবানদের অর্থ, অস্ত্রসহ রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে পরোক্ষ মদত দিতে থাকে। সেই সঙ্গে বিশাল আফিম চাষের অর্থ, বিভিন্ন রকম তোলাবাজিতে তারা বিগত বিশ বৎসরে ফুলেফেঁপে উঠে। সেই সময়ে প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরমাণু শক্তিধর মুরুব্বি রাষ্ট্রগুলি জঙ্গিবাদ নির্মূলে বদ্ধপরিকর থাকলেও কালের বিবর্তনে আজ তারাই লাল কার্পেটে তালিবানদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক করছে। জন বাইডেন মার্কিন ন্যাটোর ২০ বৎসরের সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের

আকস্মিক ইতি টানায় স্বাভাবিক প্রশ্নমুখী, কিন্তু বাইডেন সহজভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন আমেরিকার ছেলেদের (সৈন্যদের) তিনি আর মৃত্যুঝুঁকিতে রাখতে পারেন না, তবে স্থানীয় সাধারণ আফগান নাগরিক মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্তে খুব বিচলিত। বাইডেনের যুক্তিতে ৭৫ হাজার তালিবানি

সদস্য কোনভাবেই তিন লাখ আফগান নিরাপত্তা কর্মীর সামনে হুমকিস্বরূপ হতে পারে না। মার্কিনদের হয়ে কাজ করা এমন আফগান কর্মীদের জন্য ২৫০০ অভিবাসী ভিসা ইস্যু করা হয়েছে, সেনা প্রত্যাহারের পরেও আফগানিস্তানে বিশেষ নিরাপত্তায় প্রায় ৬৫০ থেকে হাজার মার্কিন সেনা সচেষ্ট থাকবে। আমেরিকার সাম্প্রতিক একটি জনমত জরিপে তাঁদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের স্বপক্ষে ছিলো। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও তালিবানদের সাথে যুদ্ধবিরতির সন্ধি স্থাপন করে গিয়েছেন। ২০০১ সালের পর আফগানিস্তানে প্রায় ৩০০০ মার্কিন সেনা নিহত হন এবং ২০,৬৬০ সেনা আহত। দীর্ঘ বিশ বৎসরে তালিবানদের উৎখাতে অন্ততপক্ষে দুই ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে। এত আত্মত্যাগের পরও আমেরিকার পিঠ দেখানো তথা সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহে তাদের পরাক্রমতা আবার প্রশ্নবিদ্ধ হলো! তবে আমেরিকার এই সিদ্ধান্তে বিভিন্ন জেহাদি এবং মুজাহিদীন গোষ্ঠী আল-কায়দা, তালিবান, লস্কর-ই-তৈয়বা, আই.এস.আই.এস, বোকো হারাম প্রভৃতি সকল এই জাতীয় জঙ্গি সংগঠন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অরাজকতার নতুন লাইসেন্স রিনিউ করলো। উল্লেখ্য যে ১৯৭১ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মিত্রদের এবং ১৯৭৫ সালে চীন সমর্থিত উগ্র কমিউনিস্ট খেমাররুজদের হাতে কম্বোডিয়াকে এরকম আমেরিকা কার্যত একা ছেড়ে এসেছিলো যাহার পরিণাম খুব নৃশংসতর হয়েছিল।

বাইডেন প্রশাসন প্রকাশ্যে তালিবানদের অস্তিত্বকে স্বীকার না করলেও তাঁদের নিজেদের বিভিন্ন বিশ্বস্ত সূত্রে অনুমান তালিবানরা অন্তত ৬ মাসের মধ্যে শাসনে ফিরছে। আশ্চর্যজনকভাবে রাশিয়া, চিনের মতো শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোও সামান্য দর কষাকষিতে তালিবানদের সকল চাহিদায় নত মস্তকে জি হুজুর করতে বাধ্য হচ্ছে। ১৯৭৯ সালে রাশিয়া আফগানিস্তান আক্রমণ করে। মোটামুটি ৯ বৎসর তাঁদের সেনা সেখানে অবস্থান করলেও সেই সময়ে পাক-মার্কিন দ্বৈত সাজোশে সেখান থেকে ফিরতে হয়েছিলো। এখন তালিবান শঙ্কায় রাশিয়া ইতিমধ্যে উত্তর আফগানিস্তানে মাজার-ই-শরিফে নিজেদের বাণিজ্যিক দূতাবাস বন্ধের ঘোষণা করে দিয়েছে। রাশিয়া চায় না আফগান ইস্যুতে শুধু আমেরিকাই হস্তক্ষেপ করুক, রাশিয়াও আফগান সমঝোতায় নিজেদের ভাগিদারি চাইছে। রাশিয়া তালিবান প্রত্যাবর্তনে এজন্য চিন্তিত যে আফগানিস্তানে মৌলবাদী কট্টরপন্থার গড় না হয়ে যায়! রাশিয়া সীমান্ত সরাসরি আফগানে না লাগলেও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজাকিস্তান সীমান্ত উভয় দেশের গা ঘেঁষাঘেঁষি। তাই আফগানিস্তানে মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী শক্তি হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে মধ্য এশিয়ার এই মুসলিম দেশগুলো প্রভাবিত হতে পারে এবং রাশিয়ার জন্য হতে পারে হুমকিস্বরূপ। তবুও তালিবান নেতৃত্ব বারংবার রাশিয়াকে আশ্বস্ত করছে যে, তাদের বুটের ছাপ আফগানিস্তানের বাইরে পড়বে না এবং তাদের মাটি প্রতিবেশি কোন মধ্য এশিয়ার দেশের হিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হবে না। তাই রাশিয়াও ঘোষণা করেছে এরকম হলে তারাও আফগানিস্তানে তালিবান ইস্যুতে কোনরকম হস্তক্ষেপ করবে না, তার মানে এই দাঁড়ালো যে তালিবানরা কয়েকটিমাত্র শর্তপূরণে আফগানিস্তান জঙ্গিবাদের পুরো আঁতুরঘর বানালেও রাশিয়ার কোন দায়বদ্ধতা থাকলো না। অল-কায়দার উপদ্রবে চীন এই কারণে এতো চিন্তিত যে তাদের আশঙ্কা সিনজিয়াং প্রান্তে সংখ্যালঘু উইগো সম্প্রদায়ের সক্রিয় আলগাবাদী সংগঠন ইস্ট তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্টে (ETIM) প্রতিবেশি তালিবানদের আশ্রয়স্থলে শরণাপন্ন হতে পারে এবং বেড়ে যেতে পারে জঙ্গিবাদ। উল্লেখ্য যে চীন আফগানিস্তানকে Bolt and Road Initiative (BR) এর আওতায় এনে সেখানে বৃহত্তর নিবেশে আগ্রহী। তালিবান কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে চীনকে অকৃত্রিম বন্ধু আখ্যায়িত করে খুব তাড়াতাড়ি আফগান পুনঃনির্মানে চীনের হস্তক্ষেপ চায় এবং চীনকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে কোনভাবেই সিনজিয়াং থেকে ইউগুর আলগাবাদীদের আফগানিস্তান প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হবে না। মূলত রাশিয়া চীনকে নিজেদের গোটে টানার তালিবানদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে আমেরিকাকে চর্তুমুখী কোনঠাসা, তাদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হাসিল করা এবং আবশ্যই আর্থিক সহযোগিতা। পাকিস্তান মার্কিন প্রশাসনকে আফগানিস্তানে তালিবান নিধনে সামরিক সহায়তার বিনিময়ে আর্থিক অনুদান এবং দ্বিতীয়তে আফগানিস্তানে মার্কিন আক্রমণের সঙ্গে পাকিস্তানকেও ধুলিস্যাতের হুমকি। তাই অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও পাক সরকারকে কিছুটা ব্যাকফুটে গিয়ে তালিবানদের বিপরীতে কাজ করতে হয়েছিলো। পাক-তালিবানদের মৌলিক আদর্শ মূলত একই, উভয়ই কট্টর ইসলামী মৌলবাদে বিশ্বাসী এবং কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ঘোর

বিরোধী। তাই অনুমান করা যাচ্ছে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার এবং পাক-মার্কিন শান্তি চুক্তি অবসানে আইএসআই এর তালেবান পৃষ্ঠপোষকতা সার্বজনীনভাবে দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। যদিও পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈয়বা এবং জামাত-উল-দাওয়া জঙ্গি সংগঠনের আইএসআই-এর সহায়তায় আফগানিস্তানে তালিবানদের হাত শক্ত করেছে সত্যি কিন্তু আফগানিস্তানের তহরিক-এ-তালিবানের প্রবক্তা সুহো শাহীন পাকিস্তানকে তালিবানের উপর তানাসাহি এবং জবাবদিহিতায় সাফ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান (TTP) এই জুলাই মাসে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন সমিত ১৫ জন সেনাসদস্যকে মৃত্যুর কোলে পৌঁছে দেয়। ২০০৭ সালে ১৩টি জঙ্গি সংগঠন মিলে এই তেহরিকে তালিবান পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো শরিয়দ আইনের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে আরো কট্টর ইসলামিক শাসনে উপস্থাপিত করা।

ভারত এমনিতেই পাকিস্তানের জঙ্গিবাদের অনুপ্রবেশে জর্জরিত, তারমধ্যে আফগানিস্তানে তালিবানি পদধ্বনিতে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো কাজ করছে। ভারতের বৃহত্তর আঞ্চলিক অর্থনৈতিক অভিলাষ, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে আফগানিস্তানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিগত দু-দশকে আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তারে ভারত প্রায় চারশোরও বেশি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বিশাল পরিকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পে ৩০০ কোটি ডলার নিয়োগ করা ছাড়াও সেখানে দিলারাম-জারাঞ্জ মহাসড়কের ২১৮ কি.মি. দীর্ঘ রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। কাবুলের নতুন আফগান পার্লামেন্ট ভবনটিও ভারত তৈরি করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলজির নামকরণে উভয়দেশের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন স্থাপন করেছে। মধ্য এশিয়ার বাজারের গুরুত্ব অনুভব করে ভারত আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে ইরান এবং মধ্য এশিয়ার সাথে দুটি পাইপলাইন তৈরির পরিকল্পনায় ছিল। তবে সাময়িক পরিস্থিতিতে বাজার এবং নিবেশের চেয়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ভারতকে বেশি উদ্বিগ্ন করছে, সেজন্য ইতিমধ্যে ভারত তাদের প্রায় ৫০০ জন কর্মীকে অপহরণের ভয়ে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। কাশ্মীর লাদাখ ইস্যুতে এমনিতেই ভারত প্রতিবেশি পাকিস্তান এবং চীনের সাথে ওহি-নকুল সম্বন্ধ, তারমধ্যে আফগানিস্তান শত্রু রাষ্ট্রে পরিণত হলে ভারত সত্যি অনেক খারাপভাবে কোণঠাসা হওয়ার সম্ভাবনায়। কারণ অতীতে তালিবান আমলে আফগানিস্তানকে জঙ্গিবাদের আঁতুরঘর তৈরি করে মুজাহিদিনরা কাশ্মীরে এসে জঙ্গি তৎপরতা চালাতো, সেটার পুনরাবৃত্তি আবার হতে চলেছে কিনা সন্দেহ। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বহুলচর্চিত কান্দাহারে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স বিমান অপহরণে পাকিস্তানের আইএস.আই এবং তালিবান সরকারের চৌথ সাজেস ছিলো। ২০০৮ সালে কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা এবং ২০১৪ সালের ২৩ শে মে মাসে হেরাতে ভারতীয় কনস্যুলেটে হামলার পিছনে তালেবানের সর্বোচ্চ শক্তিশালী অংশ হাক্কানি নেটওয়ার্কের স্পষ্ট ভূমিকা ছিলো। তাই তালিবান বর্তমানে যে হিংসার রাস্তায় পুনঃবার আফগানিস্তানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের চেষ্টা করছে ভারত সেখানেই বিদেশি দেশগুলোর কাছে আপত্তি জানাচ্ছে।

মূলত তালিবান এবং আফগান সরকারের নীতি ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। আফগান সরকার উদারবাদী ইসলামিক গণতন্ত্র, ধর্মীয় অল্পসংখ্যক এবং মহিলাদের অধিকারের নৈতিক বিচারধারার আদর্শে বিশ্বাসী। বিপরীত প্রান্তে তালিবানরা কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে ইসলামিক শাসন এবং শরিয়া আইন স্থাপনে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই তালিবানরা আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটা অঞ্চল দখল করেই স্থানীয় ধার্মিক নেতাদের কাছ থেকে সেখানকার অমুসলিম ১৫ বৎসরের মেয়ে যাদের বিবাহ হয়নি এবং ৪৫ বৎসরের বিধবা মহিলাদের ডাটা জানতে চেয়েছে কারণ তাহাদের লড়াকু তালিবানদের সাথে ধর্মান্তরিত করিয়ে বিবাহ করানোর জন্য। দখলকৃত এলাকায় তালিবানরা নারীদের শিক্ষা, চলাফেরায় স্বাধীনতা এবং পোশাক পরিচ্ছেদে নিষেধাজ্ঞা পুরুষদের বাধ্যতামূলক দাঁড়ি প্রভৃতি বিষয়ে একঝাঁক নির্দেশনামা জারি করে প্রচারপত্র বিলি করা হচ্ছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এইসব উত্তর ও মধ্যে আফগানিস্তানের নারীরা তাই অস্ত্র হাতে উঠিয়ে রাজপথে তালিবান উত্থানের বিরোধিতায়। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কোনভাবেই অন্ধকার যুগের বিচারধারার তালেবান জঙ্গি গোষ্ঠীর সমর্থক হতে পারে না। তালিবানরা এতোটাই হিংস্র এবং ভারত বিদ্বেষী যে ভারতীয় চিত্র সাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকীকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে তাঁর পকেট থেকে ভারতীয় মুসলিম পরিচয়পত্র পাওয়ার পর সেই শবের মাথার উপর একটি গাড়ি চালিয়ে দেয়। যারা ভারতে বসে শুধু ধর্মের পরিচয়ে তালিবানদের নৈতিক সমর্থন করছে তাদের কাছে দানিশ সিদ্দিকী একটি স্পষ্ট উদাহরণ। কাবুলের গুরুদ্বারের করতা পরবানের অধ্যক্ষ গুরনাম সিং জানাচ্ছেন তালিবান আতঙ্কে সেখানকার পাঁচটির মধ্যে চারটি গুরুদ্বার ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে, অবশিষ্ট ১৫০ শিখ এবং হিন্দু সম্প্রদায় অসুরক্ষিত। কানাডার খালিস্তানপন্থি শিখ সংগঠন মান্মিত সিংহ ভুল্লার ফাউন্ডেশন, খালসা এইড কানাডা, ওয়ার্ল্ড শিখ অর্গানাইজেশন ভারত সরকারের কাছে এই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আর্জি নিয়ে সুরক্ষা ও নাগরিকত্বের অনুরোধ করছে। অথচ এরাই একসময় খালিস্তান মুভমেন্টকে হাওয়া দিতে CAA বিরোধী আন্দোলনের সর্বশক্তি দিয়ে জোগান দিয়ে আসছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে গ্রেফতার হওয়া চার জঙ্গির তথ্যের ভিত্তিতে 'গাজওয়াতুল হিন্দ' বা হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সামনে রেখে বাংলাদেশের দুই জঙ্গি সংগঠন-জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), আনসার আল-ইসলাম এবং ভারতের জামাতুল মুজাহিদিন ইন্ডিয়া (জেএমএস) এর মধ্যে যোগসাজস পাওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে এইসব প্রত্যেকটি জঙ্গি সংগঠনের সাথে আলকায়দা এবং তালেবানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে যাহা অন্ততপক্ষে ভারতবর্ষের জন্য অত্যন্ত হুমকিস্বরূপ। এমনবস্থায় তালিবানরা আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিকভাবে বৈধতা হাসিল করলে এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের নিষিদ্ধ সব জঙ্গি সংগঠন তালিবান মডেল অনুসরণ করে প্রগতিশীল সবুজ পৃথিবীটাকে পৌঁছে দেবে অন্ধকারের যুগের কালো অধ্যায়ে। সেদিন গৌণস্বার্থে তালিবানদের ছাড়পত্র দেওয়া দেশগুলি হয়তো একটি ক্ষুদ্র গন্ডির বৃত্তে জড়াবস্তায় পড়ে রইবে! ◻

৫ আগস্ট, জুডিশিয়াল মার্ডার ডে

রাজ রোষে কত মানুষের যে জীবন নরক হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। কোনো সময় সুপারি কিলার দিয়ে, কোনো সময় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায়, কোনো সময় জুডিশিয়াল ভাবে, কোনো সময় ফলস অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে— এইরূপ নানান ধরনের ছল চাতুরির পথ খোলা আছে প্রশাসনের হাতে। এ ব্যবস্থাপনায় যুগ যুগ ধরে দেখা গেছে যে, শাসকের রুদ্ররোষে পড়লে রেহাই নেই। আমরা বাংলা সাহিত্যে দেখেছি, চাঁদ সওদাগরের মতো সত্যনিষ্ঠ ও আদর্শবাদীর জীবনের মহাবিপর্যয় ঘটতে, শেষ পর্যন্ত রাজশক্তি তথা মা মনসার রুদ্ররোষে শুধুমাত্র পুত্রবধুর মুখ চেয়ে তাকে অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করতে দেখেছি। বাঁচার উপায় কি, তা বলেছিল তার গুরুদেব আচার্য বল্লভ। চাঁদ সওদাগর ভাবত যে, সত্যের কোনোদিনই পরাজয় হবে না, মিথ্যা যতই প্রতাপশালী হউক, তবু সে ভঙ্গুর। এ তাত্ত্বিক ভাবনা বাস্তব জীবনের জন্য নয়। আচার্য বল্লভাচার্য তাঁর চরম দারিদ্র্য, নানান ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে বুঝেছে যে, এ জীবন অর্থহীন, রাজশক্তির কাছে আপোশ করাই শ্রেয়, বর্তমান জগতে, জীবনের কালীদহে সূর্য বলো, চন্দ্র বলো, মনে হয় যেন অন্ধকারময়, এখানে আদর্শের পিছনে ছুটে লাভ নেই। জগতে আজ এক গভীর অন্ধকার নেমে এসেছে, এখানে জ্ঞানের সম্মান নেই, বিদ্যার মূল্য নেই, সুভদ্র আচরণ নেই, সুভাষণ নেই, মাংস সুখ ছাড়া অন্য কোনো সুখ চিন্তা ভাবনা নেই।

ব্রিটিশ রাজত্বের সুচনা লগ্নেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ের শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব নিজেকে ক্ষমতাবান ও সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, পথের সমস্ত ধরনের বাধা মুছে ফেলতে যত্নবান হয়েছিলেন। তার পথের বাঁধা মহারাজ নন্দকুমারকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যদি করা হয় তবে তার উচ্চাশার পথের সমস্ত ধরনের বাধা স্থায়ীভাবে দূর হয়। মিথ্যে মামলায় অভিযুক্ত করে, বিচারের নামে প্রহসন করতে, বন্ধুবর ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে মামলা দায়ের করা হয়। প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাজা ইম্ফে, হেস্টিংসের বন্ধু হওয়ার জন্য, বিচারের নামে প্রহসন ও কলঙ্ক করতে কার্পণ্য বোধ করেননি। যথারীতি মৃত্যু দণ্ড ও তা ১৭৭৫ সালের ৫ আগস্ট খিদিরপুরের নিকট কুলি বাজারের ও হেস্টিংস সেতুর মধ্যবর্তী স্থানে নবনির্মিত বধ্যমঞ্চে প্রকাশের ফাঁসি দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বিচারের নামে প্রহসন ও কলঙ্ক স্থায়ীভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। পরে অবশ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাজা ইম্ফেকে ইম্পিজমেন্ট করা হয়, বিচারের নামে প্রহসন করার জন্য। পৃথিবীর ইতিহাসে তাই এ বিচার জুডিশিয়াল কিলিং হিসেবে কুখ্যাত হয়ে রয়ে গেছে। আজও হেস্টিংস সেতুর নাম রয়েছে, তা আর নন্দকুমারের নামে সেতু হোক, এ দাবি উঠল না। ৫ আগস্ট, তাই জুডিশিয়াল মার্ডার ডে নামে খ্যাত।

—**রাধাকান্ত ঘোড়াই,** ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

গুরু-পূর্ণিমা দিবসের তাৎপর্য

'গুরু-পূর্ণিমা দিবস' ভারতীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পারম্পর্যে এক উজ্জ্বল পূর্ণিমালোকিত দিন। এই দিনে আমি জন্মগুরু, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু নির্বিশেষে শিক্ষার সমস্ত উৎসমুখকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আর স্নেহ-ভালোবাসা জানাই, সেই প্রবহমান ধারার নিম্নমুখ অর্থাৎ ছাত্র-শিষ্য-বিদ্যার্থীদের। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গুরুমুখী। যার কেন্দ্রাচার ছিল আষাঢ়ী গুরুপূর্ণিমা উদযাপন। 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরর্দেবো মহেশ্বরঃ।/গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নম।।' জ্ঞান সমুদ্রের সমস্ত স্রোত গুরুর থেকে নেমে আসছে। তিনিই সব হয়েছেন। তিনিই চৈতন্যস্বরূপ। ড. রাধাকৃষ্ণণও সেই সনাতনী ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী ছিলেন, যার জন্মদিনে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হয় ৫ সেপ্টেম্বর।

উপনিষদে আছে 'সোহহম', আমিই সে, 'আই এম হি'। এটা কোন আমি? আমি দু'প্রকার, প্রত্যক্ষ আমি বা 'অহং'। যাকে বলতে পারি 'একলা আমি', 'স্বার্থগত আমি'; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কাঁচা আমি', স্বামীজী বলছেন, 'ছোটো আমি'। আর একটি হচ্ছে অপ্রত্যক্ষ আমি বা 'ভূমা'। এ হলো 'বড়ো আমি', 'পাকা আমি', সকল আমির সমষ্টিগত আমি। 'আমার' এই নিত্য পথ পরিক্রমা। কে দেখাবেন পথ? আমার গুরু, আমার শিক্ষক। আমার মধ্যেই সব আছে। তা সুপ্তিতে আছে। স্বামীজী বলছেন, 'Education is the manifestation of perfection already in man'। গুরু বা শিক্ষক হচ্ছেন একটি 'উশকো কাঠি'। বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে 'ব্রহ্ম বিহার' কর। ছোটো আমির মধ্যে বড়ো আমির প্রকাশ মধুর কর। নিজের মধ্যে অন্যের জন্য মৈত্রী পোষণ কর।

শিক্ষক ছাত্রের ক্ষেত্রে এটা কি হবে? শিক্ষকে-শিক্ষকে কি হবে? ছাত্রে-ছাত্রে কি হবে? উপনিষদে আছে--- 'ওঁ সহনাববতু সহনোভুনক্তু সহবীর্যং করবাহৈ/তেজস্বীনাবোধিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।/ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।' আমরা শিক্ষক-ছাত্র সমভাবে বিদ্যার্জন করব; সমভাবে বিদ্যার ফল লাভ করব, সকলে সুস্থ-সবল নীরোগ জীবনযাপন করব, কেউ কারো প্রতি বিদ্বেষী হব না, আমাদের মধ্যে সকল শান্তি-সুখ বিরাজিত হোক। বিদ্যাগার থেকে পূর্ণ মানুষ হয়ে বেরোতে হবে— নিজেকে অবিরত চিনে, নিজেকে জেনে, নিজের চিন্তা চেতনাকে উপলব্ধি করে। তবেই কিন্তু বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীকে নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারব। কারো ধার করা চিন্তা নয়, চিন্তা চুরি করেও নয়। স্বাধীন চিন্তাধারা না এলে জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিপুষ্ট হবে না।

উলটোদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে যা মণি-মাণিক্য খুঁজে পেলাম তাকে জীবনের প্রয়োজনে আনতে হবে, জীবনের সমস্যা সমাধানের কাজে লাগাতে হবে।

—**ড. কল্যাণ চক্রবর্তী,**
কল্যাণী, নদীয়া।

হিন্দুধর্ম বিশ্বশান্তির একমাত্র পথপ্রদর্শক

অশোক কুমার ঠাকুর

স্বামী বিবেকানন্দের চেতনার মূলে ছিল হিন্দুত্বের জাগরণ। তিনি সংকীর্ণ অর্থে হিন্দু জাগরণের কথা চিন্তা করেননি। তার সাধনা ছিল সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের উত্তরণ। সনাতন ভারতের শাশ্বত দর্শনের উদ্বোধন। তিনি বলতেন, 'I am condensed India', 'ঘনীভূত ভারতবর্ষ আমি'। যথার্থই তিনি ভারতবর্ষের ঘনীভূত রূপে পরিণত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের মনন উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, 'যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও তবে বিবেকানন্দকে জানো। বিবেকানন্দকে জানা মানে, বিবেকানন্দের 'জানা'কে জানা। বিবেকানন্দ গভীর অধ্যয়ন ও অধ্যাত্ম সাধনায় ভারত আত্মার মর্মবাণী মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। ভারতের অন্তরসত্তা হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টি চেতনাকে সমষ্টিগত ঐকতানে বেঁধেছে সনাতন হিন্দু পরধর্মসহিষ্ণুতা। বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীকে শোনাতে এসেছিলেন সেই শাশ্বত বাণী, 'একং স্বদিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে হিন্দু শব্দটি জুড়ে দিলেই যত বিপত্তি... আপাত ধর্মনিরপেক্ষ অথচ প্রবল সাম্প্রদায়িক, এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর তর্ক, বিতর্ক, প্রতর্কে বাধাপ্রাপ্ত হয় বিবেক-দর্শনের আবহমানতা। অথচ আমরা দেখি,১৮৯৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ধর্মসম্মেলন, শিকাগো, নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী পাঠ করছেন, 'হিন্দু, জরথুষ্টীয় ও ইহুদি— এই তিনটি ধর্মই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমানকাল অবধি এই পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। এই ধর্মগুলির প্রত্যেকটিই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি লুপ্ত না হইয়া এগুলি যে এখনও জীবিত আছে, তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে মহতী শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু একদিকে যেমন ইহুদিধর্ম তৎপ্রসূত

খ্রিস্টধর্মকে আত্মসাৎ করিতে পারা তো দূরের কথা, নিজেই এই সর্বজয়ী ধর্ম দ্বারা স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছে এবং অতি অল্পসংখ্যক পারসি মাত্র এখন জরাথুষ্টীয় ধর্মের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; অরপদিকে আবার ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর, সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে, মনে হইয়াছে যেন বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়া গেল; কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় সাগর-সলিল যেমন কিছু পশ্চাদপদ হইয়া সহস্রগুণ প্রবল বেগে সর্বগ্রাসী বন্যারূপে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ ইহাদের জননীস্বরূপ বেদোক্ত ধর্মও প্রথমত কিঞ্চিৎ পশ্চাদপদ হইয়া আলোড়নের অগ্রগতি শেষ হইলে ওই সম্প্রদায়গুলিকে সর্বোতভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট করিয়াছে।' এখানে তিনি আরও বললেন, 'বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির অবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা একমাপের জামা রাখিয়া দেয়; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ওই এক মাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে না লাগে, তবে তাহাকে জামা না পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে হইবে।'

স্বামীজী বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও দর্শন অধ্যয়ন ও অনুশীলন করে একটা সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে হিন্দুধর্মই বিশ্ব শান্তির একমাত্র পথপ্রদর্শক হতে পারে। কারণ এই ধর্ম এই দর্শনের মূল সূত্র একাত্ম মানববাদ। অতএব এই বিশ্বে হিন্দুরাই যে একমাত্র পরধর্মসহিষ্ণু— সেই কথা উচ্চকণ্ঠে বলতেও দ্বিধা বোধ করেননি স্বামীজী। বিবেকানন্দ বলতেন, 'এই ভারতে আপাত বিরোধী বহু সম্প্রদায় বর্তমান অথচ সকলেই নির্বিরোধে বাস করিতেছে। এই অপূর্ব ব্যাপারের একমাত্র ব্যাখ্যা পরধর্মসহিষ্ণুতা।' 'একং স্বদিপ্রা বহুধা বদন্তি।' এই হিন্দুত্ব ভাবনাকেই হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড হিসেবে অভিহিত করেছিলেন স্বামীজী। তিনি একাধিকবার বলেছেন, 'এই চিরস্মরণীয় বাণী আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই; এইরূপ মহান সত্য আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আর এই সত্যই আমাদের হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।' বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, 'জগতে যত জাতি আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা পরধর্মসহিষ্ণু। হিন্দু গভীর ধর্মভাবাপন্ন বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে ঈশ্বর অবিশ্বাসী ব্যক্তির উপর সে অত্যাচার করিবে। কিন্তু দেখুন, জৈনরা ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো হিন্দুই জৈনদের উপর অত্যাচার করে নাই। ভারতে মুসলমানরাই প্রথম পরধর্মালম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।'

বিবেকানন্দ বলতে কখনও দ্বিধা করতেন না, 'জগতে যতটুকু পরধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মমতের প্রতি সহানুভূতি আছে, কার্যত তাহা এইখানেই, এই আর্যভূমিতেই বিদ্যমান, অপর কোথাও নাই। কেবল এইখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রিস্টানদের জন্য গীর্জা নির্মাণ করিয়া দেয়, অন্য কোথাও নহে... যদি তুমি অন্য কোনো দেশে গিয়া মুসলমানদিগকে বা অন্য ধর্মাবলম্বীকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বলো, দেখিবে তাহারা কিরূপ সাহায্য করে। তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পরে তো সেইসঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটিরও তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। এই কারণে পৃথিবীর পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন— ভারতের নিকট পৃথিবীকে এখনও এই পরমধর্মসহিষ্ণুতা শুধু তাহাই নহে পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে।'

ছাত্রজীবনে স্বাধ্যায় এবং মায়ের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

পূর্বজরা বলে গেছেন, 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কাছে অধ্যয়নই একমাত্র তপস্যা হওয়া কাম্য। সফল হতে হলে মনুষ্যজীবনে শিক্ষার একটি অতুলনীয় ভূমিকা আছে। সে শিক্ষা হলো চরিত্রগঠন এবং পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত। এখন বর্তমান করোনাময় পরিস্থিতিতে এই প্রবন্ধে মূলত পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত শিক্ষার দিকে আলোকপাত করব। এই সময় বিদ্যালয়-কলেজ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যত বন্ধ। মোবাইল বা ল্যাপটপে পড়াশুনা চলছে। আমরা সবাই জানি যে, এই দুটি যন্ত্রের যথার্থ ব্যবহার থেকে অপব্যবহার হয় অনেকগুণ বেশি। সুতরাং, যথাসময়ে আমরা যদি সতর্ক না হই, তাহলে আমাদের ছাত্রশক্তি— যা আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যত, তারা বিপথগামী হবে। এর মধ্যে আমরা প্রায় সবাই জেনেছি যে, এই অতিমারীটি প্রাকৃতিক নয়, বরং পূর্ব-পরিকল্পিত ও প্রয়োগশালায় হয়েছে এর সূচনা। আমাদের দেশের ক্ষতিসাধন এই পরিকল্পনার অন্যতম একটি অঙ্গ। সেজন্য আমাদের বিশেষত মায়েদের এই প্রসঙ্গে অতিমাত্রায় সচেতন থাকতে হবে। রক্ষা করতে হবে আমাদের সন্তান, পরিবার, সমাজ, দেশ তথা সমগ্র বিশ্বকে। অতি সম্প্রতি রাজ্য সরকার পরিচালিত বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলে প্রচুর নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সন্তুষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। তাতে নম্বর তো অনেক এল, কিন্তু শিক্ষা? শিক্ষার প্রতিফলন নম্বর-এ নয়, যোগ্যতায়। জীবনে এরা কীভাবে সফল হবে? পুঁথিগত বিদ্যাই সবকিছু অবশ্যই নয়, কিন্তু কিছু শিক্ষা তো সেখান থেকে নিতেই হয়।

এই কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে পারেন একমাত্র বাড়ির মাতৃশক্তি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেহেতু বন্ধ, সেজন্য তাঁরা অনায়াসে নিজেরাই শিক্ষকতার দায়িত্ব নিতে শিক্ষার্থীদের থেকে নিয়মিত পড়া নেবেন। বিশেষ করে তাদের উত্তর লেখার অভ্যেস করাতে হবে। শিক্ষার্থীরা যতক্ষণ পড়বে, তার সমপরিমাণ অথবা তার থেকেও বেশি সময় লিখে অভ্যাস করবে। বিভিন্নপ্রকার প্রশ্নাবলী পাঠ্যপুস্তক বা ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, যা মায়ের নিজেরা খুঁজে খাতায় লিখে নিতে পারেন। যে সময় আমরা টিভি, হোয়াটস্ অ্যাপ, ইউটিউব নিয়ে ফোনে ব্যস্ত থাকি, সেখান থেকে একটু সময় নিজেদের সন্তানদের কল্যাণের জন্য অবশ্যই বের করে নিতে পারি। ওইসব প্রশ্নের উত্তর ছাত্র-ছাত্রীরা না দেখে লেখার চেষ্টা করবে। এর ফলে তাদের পড়াশুনার অনেক উন্নতি হবে। সমস্ত বিষয় এইভাবে অভ্যেস করাতে হবে। ছবি এঁকে (বিজ্ঞান, ভূগোল), ফরমূলা (বিজ্ঞান-অঙ্ক) ইত্যাদি খাতায় লিখে ব্যাপক অভ্যাসের প্রয়োজন। এমনকী, হাতের লেখা সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন করার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

করোনার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সময় অনেকটা সাশ্রয় হয়। সেইসময় শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই সদ্ব্যবহার করতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার নামে রমরম করে ব্যবসা করছে। আমরা প্রায়শই নিজেদের অজান্তে তাদের ফাঁদে পড়ি। অর্থ, সময়, সন্তানের সুকোমল সত্তার বিনিময়ে তাদের ফাঁদে অনাবশ্যক টেনশন নিয়ে থাকি। অন-লাইন ক্লাশ হলো— 'স্বর্ণমৃগ', এর লক্ষ্য স্থির করে ওই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি। তার পর অভিভাবকদের মগজধোলাই। মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়ে সন্তানদের ধরে-বেঁধে তাদের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে মানসিক চাপের মধ্যে ফেলেন। হাঁফিয়ে উঠে শিক্ষার্থীরা তখন অন-লাইনের হাত ধরে নেট-দুনিয়ার কালো গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকে। পরে, ভালো নম্বর পেলেও চরিত্র গঠনের ব্যাপারটা শূন্য বা তার থেকেও কম হয়ে যায়। আচ্ছা, আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ কী ওই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক করে দেবে? সমাজ তাদের থেকে কি পায়? কৃতী ছাত্র-ছাত্রী? যারা নিজেদের মা-বাবাকে ছেড়ে, নিজের দেশকে ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দেয়। এই কি লক্ষ্য? এই জন্যই কি আমরা আমাদের সন্তানদের প্রতিপালন করি?

অমোঘ সত্য হলো— মা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। সুতরাং, আমাদের সন্তানদের মঙ্গল কিসে হবে, তা আমাদের থেকে ভালো আর কেউ কীভাবে জানবে? সন্তানের সঙ্গে পড়াশুনার মাধ্যমে যুক্ত থাকলে, মা ও সন্তানের মধ্যে একটি সুন্দর বন্ধন তৈরি হয়— যা আজীবন থাকে। মানসিকভাবে পরস্পর পরস্পরের অনেক কাছে থাকে। এই তো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা আমাদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলে, সেই তো প্রকৃত শিক্ষা— সে শিক্ষা দেন মা!

রক্তচাপ কমাতে সয়াবিন খান

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

বিশ্বজুড়েই জনপ্রিয় সয়াবিন একটি উদ্ভিদ প্রোটিনের আধার। সয়াবিন দিয়ে তৈরি হয় নানান ধরনের পণ্য। শরীরের পেশি গঠনে যে নয়টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড প্রয়োজন হয়, এর সবকটিই আছে দারুণ পুষ্টিকর সয়াবিনে।

স্বাস্থ্যকর উপাদানের জন্য সয়াবিন বা সয়া পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় খাবার। যদিও বলা হয় সয়াবিনের আদি জন্ম পূর্ব এশিয়ায়। তবে এখন দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকাতেও জন্মায়। মজার বিষয় হচ্ছে, সয়াবিন খাওয়ার ধরন কিন্তু একেক দেশে একেক রকম। এশিয়ার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সয়াবিন আস্ত খাওয়া হয়। কিন্তু বাইরের দেশগুলোতে সয়াবিন অনেক বেশি প্রোসেস করেই খাওয়ার প্রচলন দেখা যায়। সয়াবিনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটি থেকে শুধু এক ধরনের পণ্য হয় না। বরং ময়দা, সয়া প্রোটিন, টফু, সয়া দুধ, সয়াবিন তেল-সহ আরও অনেকরকম পণ্য উৎপন্ন হয়।

সয়াবিনের প্রকার : সয়াবিন তিনরকম হয়, যা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে অনেকে খেয়ে থাকেন। সবুজ রঙের সয়াবিন সেদ্ধ করেই শুধু খাওয়া যায়। আবার স্যালাড, তরকারি বা স্যুপে দিয়েও অনেকে খেতে পছন্দ করেন। হলুদ সয়াবিন থেকে সয়াদুধ, টফু বা বেকিংয়ের জন্য ময়দা তৈরি করা হয়ে থাকে। আর এক ধরনের সয়াবিন হয় কালো রঙের। এটি এশিয়ায় ট্র্যাডিশনাল খাবারে ব্যবহার করা হয়।

সয়াবিন কেন ভেজিটেরিয়ানদের প্রোটিন : নিরামিষাশিদের জন্য সয়াবিন কিন্তু প্রোটিন। তার মানে সয়া থেকে মাছ, মাংস ও ডিমের প্রোটিন পাওয়া যায়। এছাড়া সয়াবিনে থাকে ৯ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড, যা পেশি ও হাড়ের শক্তি বাড়ায়। মানবশরীর নিজ থেকেই এই উপাদনগুলো তৈরি করতে পারে না। তাই যাঁরা আমিষাশী, তাঁরা মাছ, মাংস ও ডিম থেকে এই চাহিদা পূরণ করে থাকেন। এছাড়া শরীরের পেশি গঠনে যে ৯টি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, এর সবকটিই রয়েছে সয়াবিনে।

সয়াবিনের উপকারিতা : হার্টের জন্য উপকারী সয়াবিনে থাকা মোট ফ্যাটের শুধু দশ থেকে পনেরো শতাংশ ফ্যাট স্যাচুরেটেড। খাসির মাংসে এই মাত্রা অনেক বেশি, যা হার্টের অনেক বেশি ক্ষতি করে থাকে। তাই বলা যায়, সয়াবিনের তৈরি টফু মাংসের বিভিন্ন খাবার থেকে হার্টের জন্য অনেক বেশি উপকারী।

জিরো কোলেস্টেরল : অন্য যে কোনও সবজির মতো সয়াবিনও প্রাকৃতিকভাবে কোলেস্টেরলমুক্ত। নানা গবেষণায় দেখা গেছে, সয়াবিন শরীরের চার থেকে ছয় শতাংশ খারাপ কোলোস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। তাই বোঝাই যাচ্ছে, সয়াবিন হতে পারে একটি স্বাস্থ্যকর পছন্দের খাবার।

ফাইবারে পরিপূর্ণ : এক কাপ সয়াবিনে দশ গ্রাম ফাইবার আছে। যেখানে সমপরিমাণ মাছ, মাংস ও ডিম ফাইবারের পরিমাণ খুবই কম। এছাড়া সয়াবিন আরও যে উপকার করে, তা হলো অন্য খাবার থেকে যে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল পাওয়া যায়, তা কমাতে সাহায্য করে।

ব্লাডপ্রেশার হ্রাস করতে : ব্লাডপ্রেশার কমাতে একজন ব্যক্তির প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় যুক্ত করা যেতে পারে সয়াবিন, যা স্ট্রোকের আশঙ্কা ১৪ শতাংশ কমায়।

পটাশিয়াম বেশি : এক কাপ সয়াবিনে থাকে ৮৮৬ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম। একটি মাঝারি আকারের কলার তুলনায় এই পরিমাণটি দ্বিগুণ। এছাড়া শরীরের সারা দিনের চাহিদার এক তৃতীয়াংশ পূরণ করতে পারে এই এক কাপ সয়াবিন।

হাড়ের জন্য উপকারী : পুরুষদের থেকে মহিলারা হাড়ের সমস্যায় ভোগেন অনেক বেশি। চিকিৎসকেরা হাড়ের চিকিৎসায় সয়া দিয়ে তৈরি খাবারগুলো খেতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এমনকী বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, মহিলাদের শরীরের হাড় মজবুত করতে দারুণভাবে কাজ করে সয়াবিন।

প্রোস্টেট ক্যানসারে উপকারী : সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় সাধারণ একটি ক্যান্সার হলো প্রোস্টেট ক্যান্সার। এশিয়ার যে দেশগুলোতে বেশি সয়াবিন খাওয়া হয়, সে দেশের মানুষের এই ক্যান্সারে কম ভোগেন। গবেষকরা বলেন, সয়াবিনের উপকারী উপাদান টিউমার গ্রোথ কমাতে সাহায্য করে।

ব্রেস্ট ক্যানসার প্রতিরোধক : শিশু বয়সে বা টিনএজার থাকতে অনেক বেশি সয়াবিন খেলে, তা মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় প্রায় অর্ধেক। এমনকী প্রাপ্ত বয়স্করাও যদি প্রচুর পরিমাণে সয়াবিন খান, তাঁদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমবে। গবেষকরা বলেন, সয়াতে থাকা ইসোফ্লোভন ও ফিটনউট্রিয়েন্ট ক্যান্সার টিউমার কমাতে সাহায্য করে।

(লেখক বিশিষ্ট চিকিৎসক)

ডিএনএ নিয়ে দু'চার কথা

ডিএনএ : ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (ইংরেজি ডিএনএ) একটি নিউক্লিক অ্যাসিড যা জীবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের জিনগত নির্দেশ ধারণ করে। সকল জীবের ডিএনএ জিনোম থাকে। একটি সম্ভাব্য ব্যতিক্রম হচ্ছে কিছু ভাইরাস গ্রুপ যাদের আরএনএ জিনোম রয়েছে, তবে ভাইরাসকে সাধারণত জীবন্ত প্রাণ হিসেবে ধরা হয় না। কোষে ডিএনএ-র প্রধান কাজ দীর্ঘকালের জন্য তথ্য সংরক্ষণ। ডিএনএ-র যে অংশ জিনগত তথ্য বহন করে তাদের বলে জিন, কিন্তু অন্যান্য ডিএনএ ক্রমের গঠনগত তাৎপর্য রয়েছে অথবা তারা জিনগত তথ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

ক্রোমোজম : কোষের নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ নিউক্লিয় জালিকা থেকে উৎপন্ন নিউক্লিয় প্রোটিন দিয়ে গঠিত সপ্রজননশীল যে সূত্রকার অংশ জীবের বংশগতি ও বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং প্রজাতির পরিব্যক্ত প্রকরণ ও বিবর্তনের মূখ্য ভূমিকা পালন করে, তাই ক্রোমোজোম।

জিন বা বংশাণু : বংশাণু বা জীন (ইংরেজি **Gene**) জীবন্ত প্রাণের বংশগতির আণবিক একক। এটি বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় মূলত ডাইঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ) এবং রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (আরএনএ)-এর প্রসারিত অর্থে যা পলিপেপটাইড বা একটি আরএনএ শৃঙ্খলকে গঠন করে। জীবন্ত প্রাণী বংশাণুর ওপর নির্ভর করে, কারণ তারা সকল প্রোটিন এবং গঠনমূলক আরএনএ শৃঙ্খলকে স্বতন্ত্রিত করে। বংশাণু প্রজাতির তথ্যধারণ করে এবং প্রাণীর কোষকে নিয়ন্ত্রিত করে। এর মাধ্যমেই প্রজাতির গুণ অব্যাহত থাকে। সমস্ত জৈবিক বৈশিষ্টধারণকারী প্রাণীর বংশাণু আছে। ইংরেজিতে জিন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ জেনেসিস থেকে যার অর্থ 'জন্ম' বা জিনোস থেকে যার অর্থ 'অঙ্গ'।

(সংকলন : অনামিকা দে)

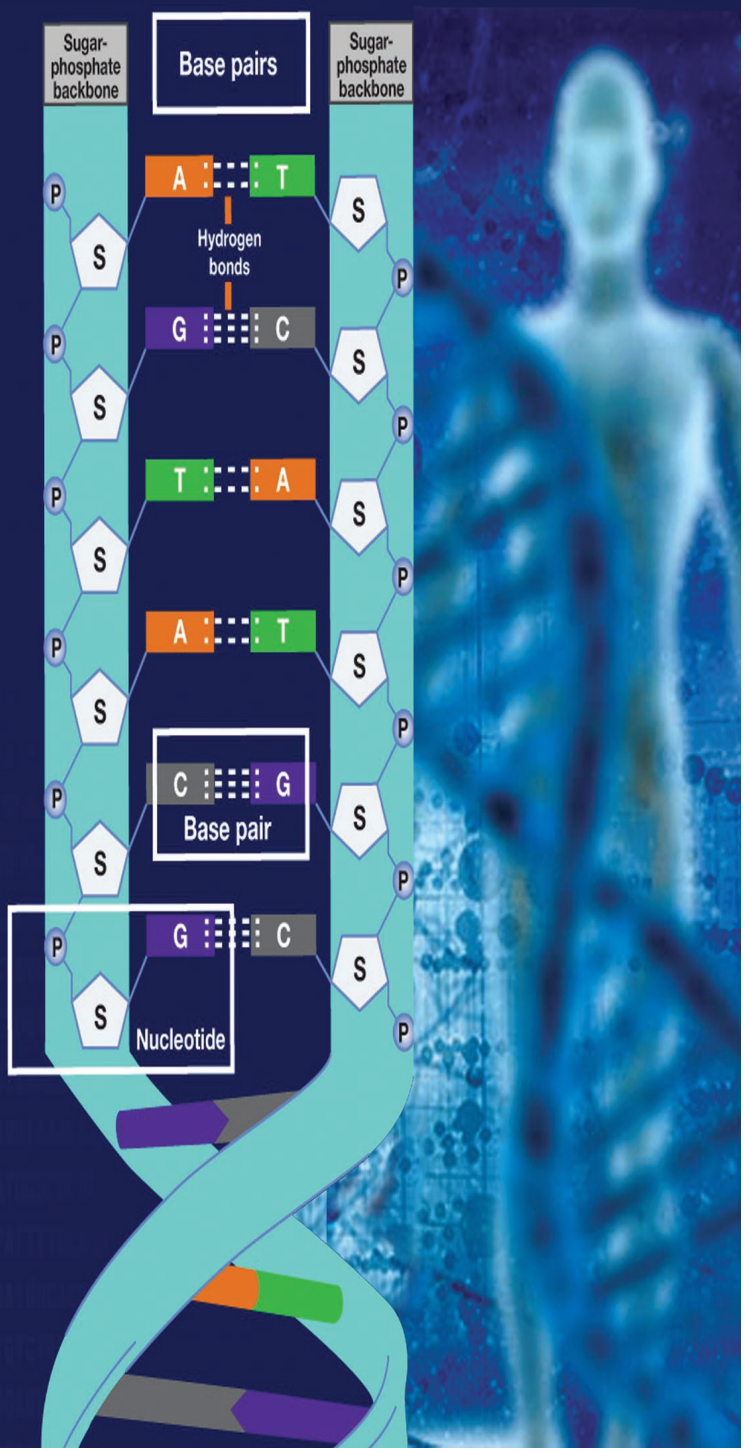

উপাস্য বদলালে জিনের বদল হয় না

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমরা ভারতীয়রা সারা বিশ্বকে বিস্মিত করেছি কারণ আমরা বিশ্বাস রাখি 'অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্/ উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'— সব ক্ষুদ্রচেতনাই আপন পর ভাগ করে নেয়। ব্যতিক্রমী আমরা ভারতীয়রা যারা সবাইকে এক করে চলতে জানি। আবহমানকাল ধরে ভারত সেই বার্তা দিয়ে আসছে। এই যে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে এতো বাদানুবাদ হয়, কিন্তু আমরা যদি একটু তলিয়ে দেখি তাহলে এটাই তো দিনের শেষে সত্যি যে ভারতীয় হিন্দু মুসলমান একই জিন বহন করছে। এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরুর ১৯৬৪ সালের মে মাসের একটি সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ না তুললেই নয়, 'Hindus...are not a proselytising race...Muslims of India are descendants of Hindus. Only a Handful came from outside.'

হ্যাঁ এটা ঠিকই যে এ দেশে মুসলমান আক্রমণ এবং ধর্মান্তরকরণে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার সঙ্গে এটাও তো ঠিক জিনের প্রবাহ যেমন ঘটেছে তেমনই সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতির পরিবর্তনের বন্যাও নানান সময় এসেছে। আজ যদি যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতায় একটা বাঙ্গালি মুসলমান মেয়ে কোনও মুসলমান সংস্কৃতির সাজসজ্জার নিদর্শন না রাখে তবে তো লাল পেড়ে শাড়িতে তাকে উমা বলে মনে হবে। কার চোখে ধরা দেবে যে সে মুসলমান? কারণ মরফোলজিতে ভারতীয় হিন্দু- মুসলমান এক। জিন এক বলেই মরফোলজি এক। তাহলে এখন জিজ্ঞাসা এটাই এই 'Handful' বহিরাগত মুসলমান কারা? যারা এদেশ আক্রমণ করেছিল তারাই। ইতিহাসের পাতা এটাই বলে সুলতান মামুদ ১১ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম আক্রমণ শুরু করে। মুলতানের রাজা জয়পাল এবং পুত্র আনন্দ পাল মামুদের বাহিনীর কাছে পরাস্ত হন। ভারতীয় ইতিহাস বিশেষজ্ঞ স্ট্যান্সলি লেন পুল এই আক্রমণের যে গবেষণা করেছেন তাতে পাতার পাতা জুড়ে রয়েছে মামুদের অত্যাচার লুঠ রক্তক্ষয় ও ধর্মান্তরকরণ। পঞ্জাব প্রদেশের ভেরায় ছিল কাবুলের সঙ্গে প্রধান বাণিজ্যপথ। ভেরার রাজা বিজয় রায় মামুদের কাছে পরাস্ত হলে মামুদ পুরো নগরটাই তছনছ করে ও শিশু নারীদের ধর্মান্তরিত করে।

বিজ্ঞানসম্মত মননে ভাবলে পরিষ্কার হবে, অমানবিক অত্যাচারে ভেরা নগরের যারা ক্রীতদাসে রূপান্তরিত হন এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন তারা সংস্কৃতির ভিন্নতায়

ধর্ম বদলালেও রক্তের মলিকিউলার বায়োলজি বদলায় না। দেশটাও কিন্তু বদলায়নি কেউ। মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি যারা করেন তাদের স্টাইলেরই শুধু বদল দরকার।

অনুপ্রবেশ করলেও তাদের জিনগত পরিবর্তন হলো কী? তা তো একই থাকল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাজা জয়পালের দৌহিত্র জানুজা যুদ্ধে পরাজিত হলে কেবলমাত্র প্রাণে বাঁচতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মথুরা আক্রমণ থেকে সোমনাথ মন্দির ধ্বংস— এই ইতিহাস আমাদের জানা। মামুদের সমসাময়িক ইতিহাসবিদ আবুল হুসাইন মন্তব্য করেছেন, 'মাহমুদের ভারত আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচার।' এরপর বিভিন্ন সময়ে নানান ডকুমেন্টস এবং রিপোর্ট হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক কিশোরী শরণ লালের গবেষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর রচিত Theory and Practice of Muslim State in India বইতে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার তথ্য পরিসংখ্যান বিদ্যমান। ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আক্রমণ এবং রাজত্ব সম্প্রসারণের অধ্যায়কে সবচেয়ে রক্তাক্ত অধ্যায় বলেছেন। মামুদের সময় থেকে শুরু করে নোয়াখালি দাঙ্গা বা সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে দুর্গা পুজো বন্ধ

করে হিন্দুদের কোণঠাসা করা--- এগুলি রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় যুদ্ধ। হিসেব মতো দেখলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ দেশের প্রত্যেক মুসলমানেরই মুসলমান হওয়ার পশ্চাতে কোনো না কোনো যুদ্ধ, হার জিত এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার কাহিনি আছে। হয়তো ইতিহাস এভাবেই তৈরি হয়। কিন্তু যাই ঘটেছে তা এই ভারতের মাটিতেই ঘটেছে।

তাই সেই ইতিহাস যার ওপর আমাদের কারোর নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তা আজ ইতিহাসই। বর্তমান এটাই যে আমরা সামাজিক ভাবে 'স্যালাড বাউল' থিওরিতে বিশ্বাস করি। আমরা 'মেলটিং পট' তত্ত্ব মানি না। আমরা ইনক্লুসিভ পলিসিতে বিশ্বাস করি। আমরা জানি হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক হলেও আসলে একই জিন ব্যাঙ্কের এদিক আর ওদিক। তাই কাউকে বাদ দিয়ে পথ চলা সম্ভব না। আজকে তিন তালাক রদ মুসলমান সমাজকে মধ্যযুগীয় আধিপত্যবাদ থেকে উত্তরণের দিকদর্শক। নেহরু আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে (১৯৪৮) বলেছিলেন, 'India's strength has been twofold: her innate culture which flowered through ages and her capacity to draw from other sources and thus add to her own' আমরা প্রত্যেক ভারতীয় এই বহুত্ববাদের ধারক ও বাহক। আজ যা আমার কাল তা তোমার এবং সকলের —এই দর্শনেই ভারত বিশ্ব সেরা। প্রত্যেক ভারতীয় মুসলমান আসলে এই বহুত্ববাদেরই অংশ। যেখানে আমি-তুমি ভেদাভেদ নেই। ফিরে দেখব না আমরা সেই কলঙ্কিত ইতিহাস। অবশ্যই প্রকৃত ইতিহাস পুনর্লিখিত হোক। উদ্ভাসিত হোক। তা যেন একটিও ভারতীয় নাগরিকের শিরঃপীড়ার কারণ না হয়।

ইতিহাসই বলে ইতিহাস লেখাটা সময়ের কাজ। যেমন ভাবে জিন তার সমসত্তা ধর্মে হিন্দু মুসলমান সবার মধ্যে মিশে আছে তেমন ভাবেই নানান অভ্যাস সংস্কৃতিও মিলে মিশে গেছে। অজ্ঞাত এক নিঃশব্দ পরিবর্তনের সাক্ষী আমরা সবাই। কংগ্রেসের রাজনীতি তার প্রয়োজনে মুসলমানদের আগে ধর্ম ও পরে জাতীয়তাবাদী হতে বলেছে। তাই একটা বড়ো অংশ বারে বারে পিছিয়ে থেকেছে। ১৯৫৫-তেই জে.বি. কৃপালনী মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ড গঠনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এবং নেহরুকে 'কমিউনাল' বলে আক্রমণ করতেও পিছপা হননি। ১৯৫৯-এ রাজাজি এই কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও স্বতন্ত্রতা পার্টি গঠন করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যেন তিনটি শব্দকে না ভুলি। স্টেট— যা কেবল নিজেরটুকু বোঝায়। আমরা নেশান শব্দে বিশ্বাস রাখি— যা সবার জন্য। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়। শেষটি হলো সিভিলাইজেশন। আমরা সিভিলাইজেশনকে অনেক সময় কালচারের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলি। কালচার যেখানে পৃথক কথা বলে, সিভিলাইজেশন সেখানে সংযুক্ত হতে বলে। তাতে ভুল থাকতে পারে, ক্ষত থাকতে পারে। কিন্তু ক্ষতি নেই। তাই পরিশেষে এটাই বলার, ভারতীয় হিন্দু মুসলমান উৎসস্থল এক ও অভিন্ন। দেশমৃত্তিকায় আজ যারা ভারতীয় তারা সমান অধিকারে প্রেম যোগে সহাবস্থান করবে। ১৯৮৮-এ পুনেতে অলটবিহারী বাজপেয়ী বিনায়ক দামোদর সাভারকরের স্মৃতি ও সম্মান জ্ঞাপনায় সাভারকরের দর্শন উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'For me, Hindu Nation and Hindi Nation are synonymous. When Savarkar spoke of a Hindu Nation, he also spoke of an Indian (Hindi) State. Savarkar envisioned a State that does not distinguish between citizens based on religion and worship...'

আমরা যেন মনে রাখি বাঙ্গলার নবদ্বীপে সংস্কৃত ন্যায় চর্চার কেন্দ্র হয়েছিল সুলতানি আমলে। দারাশিকো বেদান্ত পাঠ করেছেন বারাণসীর পণ্ডিতদের কাছে। এই ইতিহাস বারংবার বুঝিয়ে দেয় তৈরি করা বিভেদটার ওপর আজকের 'ওদের আমাদের' তত্ত্বের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন নিয়ন্ত্রণ নেই জিনের গতিতে। ধর্ম বদলালেও রক্তের মলিকিউলার বায়োলজি বদলায় না। দেশটাও কিন্তু বদলায়নি কেউ। মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি যারা করেন তাদের স্টাইলেরই শুধু বদল দরকার।

(লেখিকা বিশিষ্ট জীবরাসায়ণিক এবং গবেষক)

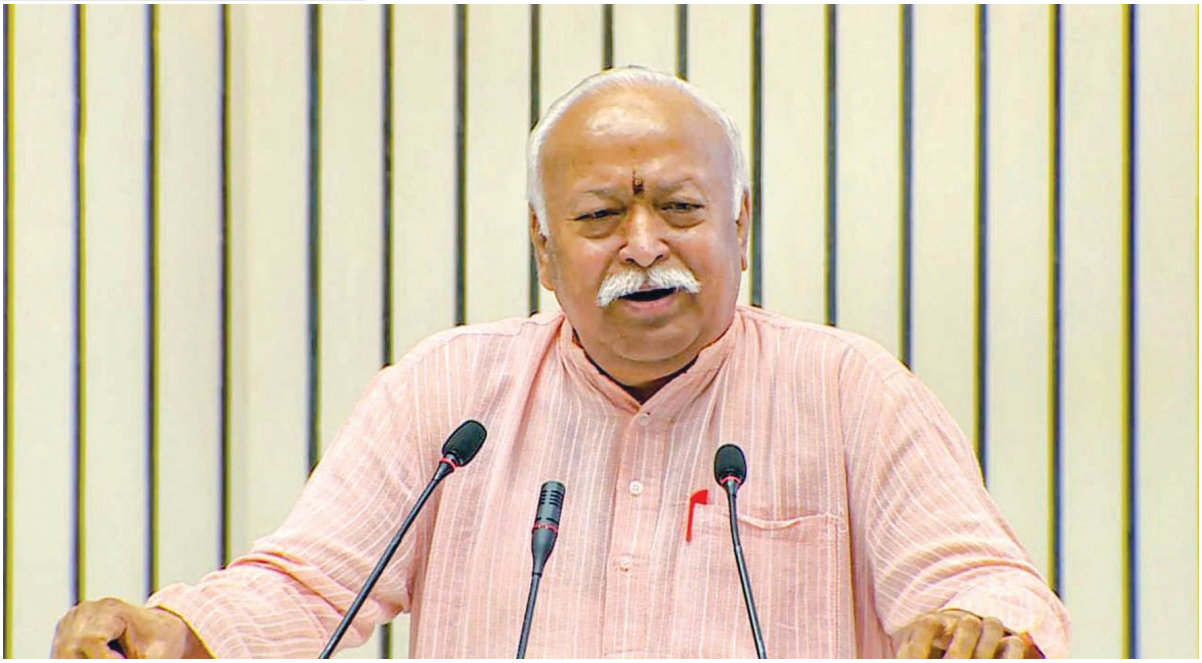

মোহন ভাগবতজীর ভাবনা ভারতীয়ত্বেরই ভাবনা

সুজিত রায়

‘ধর্ম যাই হোক না কেন, হিন্দু-মুসলমান আলাদা নয়। সব ভারতীয়র ডিএনএ এক।’ সম্প্রতি গাজিয়াবাদে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে একথা বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক বা সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল : ‘হিন্দুস্তানি ফার্স্ট, হিন্দুস্তান ফার্স্ট।’ ওই বক্তব্যের সূত্র ধরেই ভাগবতজী বিস্তারিত বিশ্লেষণে বলেন, ‘হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আসলে ভুল কথা। কারণ হিন্দু-মুসলমান অভিন্ন। ধর্ম আলাদা হলেও। ধর্ম আলাদা হলেও সকলের ডিএনএ এক। আমরা সবাই ভারতবাসী।’

মোহন ভাগবতজী একটি সংখ্যালঘু মঞ্চ থেকে এ কথা বলার পরই শুরু হয়ে গেছে শোরগোল। একদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠনে, অন্যদিকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনেও এ নিয়ে শুরু হয়েছে কাজিয়া। যেমন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) প্রধান আসাউদ্দিন ওয়াইসি ভাগবতজীর ভাষণের সমালোচনা করে বলেছেন, ‘নাথুরাম গডসের হিন্দুত্বের ভাবনার অবিচ্ছিন্ন অংশ হলো কাপুরুষতা, হিংসা এবং খুন। সেই চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে জায়গায় জায়গায় মুসলমান জনগণকে পিটিয়ে খুন করার ঘটনাবলীর মাধ্যমে।’ ‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হিন্দুত্বের ভাবনা এবং সংখ্যালঘুকে বিচ্ছিন্ন জাতি হিসেবে দূরে ঠেলে রাখার দীর্ঘদিনের প্রয়াস’কে সমালোচনা করেছেন মুসলমান ঋদ্ধ সমাজের অনেকেই। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক মির্জা অসমের বেগ, লেখক খাজা ইফতেকার আহমেদ, অধ্যাপক মহম্মদ সাজ্জাদ, দারুল উলুমের শিক্ষক দেওবন্দ, সমাজসেবী মহম্মদ জাহিরুদ্দিন প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের বক্তব্যেরই মূল সুর হলো, দীর্ঘদিন ধরে আরএসএসের হিন্দুত্বের ভাবনা বৈচিত্র্যময় ভারতীয় জনসমাজে বিচ্ছিন্নতাবাদের সুর চড়িয়েছে। আজ হিন্দুরাজনীতির ধ্বজাধারী বিজেপি রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার পর মুসলমান জনসমাজের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের ঝড়

উঠেছে। শুধু মুখের কথায় সব সমস্যা মিটবে না।

অন্যদিকে হিন্দুধর্মের (হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুত্ব এক নয়) রক্ষণশীল সংখ্যাগুরু মানুষের একাংশও সোচ্চার। তাঁদের বক্তব্য, ভারতবর্ষের ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধরে একথা পরীক্ষিত সত্য যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত জনসমাজ বিষধর সাপের মতো। একটু অসাবধান হলেই তাঁরা হিন্দুদের ছোবল মারতে দ্বিধা করে না। সেই বিষধর ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সম ডিএনএ গোত্রীয় বলে মোহন ভাগবতজী হিন্দুদের জীবনে এক কালান্তক আঁধার নামিয়ে আনতে চাইছেন। তাঁরা খুল্লমখুল্লা সমালোচনায় নেমেছেন— বিশ্বব্যাপী মুসলমান জনসমাজ রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে একরোখা মনোভাব নিয়ে বিশ্ব দখল করতে চাইছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতবর্ষে তারা হিন্দুদের থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণের প্রকাশ্য খেলায় নেমেছে। তথাকথিত সুযোগসন্ধানী ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা নিজেদের আখের গোছাতে ওই ধ্বংসাত্মক মনোভাবের মুসলমানদের ইন্ধন জুগিয়ে ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করতে ব্যস্ত। অতএব হিন্দু-মুসলমান একই গোত্রীয় বলে আরএসএস প্রধান হিন্দু জনগণ এমনকী হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতিরও বিপদ ডেকে আনছেন।

সমালোচকরা আরও চটেছেন, মোহন ভাগবতজীর একগুচ্ছ ভাষণের উর্দু অনুবাদ বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার খবরে। ন্যাশানাল কাউন্সিল ফর প্রোমোশন অব উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ (এনসিপিইউএল)— হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত তাঁর ভাষণগুচ্ছ সমন্বিত বই 'ভবিষ্য কা ভারত'-এর উর্দু অনুবাদ— 'মুস্তাকবিল কা ভারত' নামে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এনসিপিইউএল-এর অধিকর্তা এবং বইটির উর্দু অনুবাদক ড. আকিল আহমেদ যদিও বলেছেন, আরএসএস সম্পর্কে মুসলমানদের মানসিক বিভ্রান্তি মোচনের উদ্দেশ্যেই এই বই, তাতে কিন্তু না মুসলমান না রক্ষণশীল হিন্দু— কেউই খুশি হননি। মুসলমান ব্যাতিরেকে হিন্দুত্ব অর্থহীন— মোহন ভাগবতজীর এই বক্তব্যে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুরা সায় দিতে রাজি নয়, তেমনি মুসলমানরাও ভাগবতজীর এই মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। দু'পক্ষেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্ন বলেই সমালোচনার ধার ক্রমাগত ক্ষুরধার হয়েই চলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা দরকার, সঙ্ঘপ্রধান মোহন ভাগবতজীর বক্তব্য ভুল না সঠিক। সঙ্ঘের গঠন ও কার্যাবলীর একেবারের প্রথম পর্যায়েই দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক গুরুজী মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কারণ হিসেবে বলেছিলেন, 'হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতিতে যা কিছু সর্বোত্তম, সে সবের পুনরুজ্জীবন ও তার দৃঢ় ভিত্তির আধারে সমাজের সকল মানুষকে মৈত্রীর গভীর সূত্রে বাঁধার জন্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সেই কাজটি করে এসেছে। আমরা সকলেই এক সাধারণ পরম্পরার অধিকারী। আমাদের বাইরের বৈচিত্র্যের আড়ালে এক অভিন্ন ঐক্য রয়েছে— এই সত্যের অনুভব প্রত্যেক ব্যক্তির মনে সঞ্চারিত করে সমাজের মধ্যে বিভেদের প্রবৃত্তির পরিবর্তে পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালোবাসা, স্নেহপ্রীতির পাশাপাশি নিজ মাতৃভূমি ভারতের প্রতি অনন্ত প্রেম-ভক্তি জাগিয়ে তুলতেই সঙ্ঘ চেষ্টা করছে।'

এখানেই স্পষ্ট, আরএসএস একটি জাতিভেদহীন কর্মময় জাতীয় সংহতির সংগঠন। আর এই সংহতি কখনই জাতীয়তাবোধ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এমনকী ভারতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্র হিন্দুত্ব যা প্রকৃত অর্থে ভারতীয় জীবনধারার মূল প্রবাহ, তারও বহির্ভূত নয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার স্পষ্টতই বলেছিলেন, 'সঙ্ঘের কাজ ও বিচারধারা আমাদের নতুন কোনও আবিষ্কার নহে। সঙ্ঘ আমাদের পরমমিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম, আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি, আমাদের স্বতঃসিদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র এবং অতীতকাল হইতে প্রচলিত পরম পবিত্র ভগবাধ্বজকে সেই একই রূপে সকলের সামনে আনিয়া রাখিয়াছে...।'

সঙ্ঘের কাছে— স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণী আজও মূর্ত, জাগ্রত— 'ভুলিও না— নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বলো--- আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধ্যক্যের বারাণসী, বলো ভাই— ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বলো দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

আজ যাঁরা--- হিন্দু অথবা মুসলমান, বিশেষত রক্ষণশীল হিন্দু অথবা রক্ষণশীল

আর এস এস-এর আয়োজনে ইফতার পার্টি।

ফঃ ৪

মুসলমান— মোহন ভাগবতজীর ভাষণের সমালোচনায় মুখর, তাঁরা আশা করি বিবেকানন্দ, গোলওয়ালকার ও হেডগেওয়ারের বক্তব্য অনুধাবন করবেন যে সঙ্ঘ হিন্দুত্বের পূজারী। হিন্দুরও পূজারী। কারণ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামক সাংস্কৃতিক সংগঠনটির কাছে হিন্দু মানে কোনো জাতি নয়। সঙ্ঘের কাছে বরাবরই ভারতে বসবাসকারী এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেই হিন্দু। ভারতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের সমান নাগরিক অধিকারকেও আরএসএস স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে চিরকাল।

যদিও সঙ্ঘের এই জাতীয়তাবাদ কিংবা হিন্দুত্বকে মুসলমান শিক্ষিত জনসমাজেরও বৃহত্তর অংশ সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার অবকাশ পাননি। তাই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুল ইসলামকে বলতে হয়েছে— ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের সঙ্গে সঙ্ঘের অনেক পুরনো সম্পর্ক। তাই আজও প্রায় প্রতিটি মুসলমান সংগঠন— তা সে ধর্মীয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক যে চরিত্রেরই হোক না কেন, জোর গলায় দাবি করে, সঙ্ঘ মুসলমান বিরোধী সংগঠন।

এই অভিযোগ যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ মোহন ভাগবতজীর সাম্প্রতিকতম ভাষণ। যেখানে তিনি হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছিন্নতার কথা বলেননি। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সমাজের মূল স্রোত থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা, যা আদতে ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তিগুলির একটি দেশদ্রোহী পরিকল্পনা। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার পাঁচটি বর্গ অনুসরণ করলেই মুসলমান সম্পর্কে সঙ্ঘের বক্তব্য কী তা পরিস্ফুট হয়ে যায়।

১৯৭৮-এর মার্চ মাসের সভায় গৃহীত প্রস্তাব ছিল, '৭৭ সালের গৃহীত সিদ্ধান্ত— বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মত-পথের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব দূর করে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির পথে এগিয়ে যাওয়াকেই আরও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করতে হবে। কারণ এই বিশ্বাস ও বোঝাপড়া জাতীয় সংহতিকে ত্বরান্বিত করে। নানা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে মুসলমান, খ্রিস্টান ও অন্যান্যদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার বাতাবরণ রয়েছে তা দূর করতে সঙ্ঘ বদ্ধপরিকর। এজন্য প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক ও স্পর্শকাতর বিষয়ের ক্ষেত্রে অতি সাবধানী পদক্ষেপ। কেননা, বোঝাপড়া ও বিশ্বাসের অভাবই সংখ্যালঘু এবং রক্ষণশীলদের বিচ্ছিন্ন করে রাখছে।

১৯৮৬ সালে তামিলনাড়ুর রঘুনাথপুরমে সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসের জনসভায় ভাষণ শোনেন এক মুসলমান যুবক। তিনি প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— 'জামাত নেতারা বলেছিলেন, আরএসএস নাকি একেবারেই যুক্তিহীন মুসলমান বিরোধী একটি সংগঠন। আজ মিছিল হবে। দাঙ্গা হবে। তাই কোনো মুসলমান যেন ওই সভায় না যায়। আমি ঝুঁকি নিয়েই এসেছিলাম সত্য কী ও কোনটা তা জানার জন্য। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আরএসএস প্রধানের বক্তব্য দেশপ্রেমে পূর্ণ। তিনি যা বললেন তার সঙ্গে কেউই দ্বিমত পোষণ করতে পারবেন না।' ঠিক এমনভাবেই ভুল ধারণা দূর করে রাজস্থানের বাঁশওয়ারার আজিজ হোসেন আর তার ভাই ইলিয়াস সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন। পুনের এক প্রগতিশীল মুসলমান হামিদ দলওয়াইয়ের মেয়ে পুরুষের বহু বিবাহ ও নির্মম তালাক প্রথার বিরোধী ছিলেন। ফলে কোনো মুসলমান যুবক তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিলেন না। সঙ্ঘের এক স্বয়ংসেক ওই তরুণীকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছিলেন।

এই উদাহরণগুলো পরিস্ফুট করে— সঙ্ঘ শুধু হিন্দুদের নয়, মুসলমানদেরও সদস্যপদ দেয় এবং এবং হিন্দু-মুসলমান বিবাহেও আরএসএসের কোনো আপত্তি ছিল না। আজও নেই।

ঠিক এই কারণেই হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক জ্যোতির্ময় শর্মা লিখেছেন— 'আরএসএসকে কোনও বিশেষ লেবেল দেওয়া আসলে এক ধরনের বৌদ্ধিক আলস্য। এটা কোনও গভীর গবেষণা বা বৌদ্ধিক চর্চার ফসল নয়।' দ্য ব্রাদারহুড অব স্যাফ্রন গ্রন্থের লেখক ওয়াল্টার অ্যান্ডারসন লিখেছেন— পৃথিবীর অন্য কোনো সংগঠনের সঙ্গে সঙ্ঘের তুলনা চলে না। এত পোক্ত সাংগঠনিক কাঠামো আর দ্বিতীয় কোনো সংগঠনের নেই।

আসলে গোড়ায় গলদটা তৈরি করা হয়েছে ১৯৪৭-এর পরে। স্বাধীনতার পরে যে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এসেছিল সেখানে দলিত, নারী ও বনবাসীদের কথা নেই। সরকারি পঙ্গু জাতীয়তাবাদকেই আমরা ধর্ম বলে মেনে নিয়েছি। সঙ্ঘের জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিত অনেক বড়ো। সেটাই লিখে গেছেন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী নেতা ড. সৈফুদ্দিন জিলানি। তাঁকে এক সাক্ষাৎকারে গোলওয়ালকার বলেছিলেন— 'দেশের জন্য যে যে জায়গায় আমরা জড়িত, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো ব্যবধান আমরা করি না। কিন্তু লোকে বিষয়টিকে কীভাবে দেখে? বোধহয় বর্তমানে সবাই রাজনৈতিক প্রাণী হয়ে গেছে। সকলেই ভাবে, রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের দাবি ও সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেওয়া যাবে, বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। এর সংশোধন সম্ভব যদি লোকে রাজনৈতিক না হয়ে দেশপ্রেমিক হয়। কেবল দেশপ্রেমের আধারেই সকল অস্থিরতার দ্রুত অবসান ঘটবে।'

এই কথার সূত্রেই তাই জিলানি লিখেছেন, 'আরএসএস এদেশের মুসলমানদের শত্রু নয়, বরং ওদের বন্ধু। মুসলমানরা তা অনুভব করেন না কারণ মুসলমানরা নিজেরা নিজেদের কথা ভাবে না। অজ্ঞ, অভিসন্ধিময় নেতৃত্বের হাতে ভাবনার দায় ছেড়ে দেয়। ...আমাদের নেতারা সমস্ত দোষ হিন্দুদের ওপর চাপাতেই উদগ্রীব। মুসলমানদের বেকসুর খালাস দিতেই অভ্যস্ত। এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম করতে উৎসাহিত হচ্ছেন।' গুরুজী জিলানিকে বলেছিলেন, জনসঙ্ঘ ভারতীয়করণের কথা বলেছিল। সংখ্যালঘুরা ধরে নিয়েছিলেন, ভারতীয়করণ মানে হিন্দুকরণ। এত বিভ্রান্তি কেন? ভারতীয়করণ মানে তো সকল মানুষকে হিন্দুকরণ বোঝায় না! আসলে ভারতীয়করণ মানে তো একই উৎসে বিশ্বাসী হয়ে ওঠা। তাতে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে যায়।

আজ যখন গোটা দেশ জুড়ে ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি, বিশেষ করে নিও-লিবারেল বামপন্থীরা ও তৃণমূল কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে সঙ্ঘকে ফাঁসির আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে তখন তাই মোহন ভাগবতজীকে সাম্প্রতিকতম ভাষণ দেবার আগেই বলতে হয়েছে, 'আমি ভোটের রাজনীতি করতে আসিনি। ওটা আমার কাজ নয়। সুতরাং কেউ যেন মনে না করেন, হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনীতি করতে এসেছি।'

আর এস এস নেতা ইন্দ্রেশ কুমারকে রাখী বাঁধছেন মুসলিম বোনেরা।

এনসিপিইউএল-এর ডিরেক্টর ড. আকিল আহমেদ মুসলমান সমাজের কাছে সঙ্ঘের পৌঁছে যাওয়াকে স্বাগত জানিয়েই বলেছেন, 'ভাগবতের ভাষণগুলি ভারত সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণাকে বদলে দেবে। তাঁরা বুঝতে পারবেন হিন্দুত্ব হলো ভারতীয় জীবনবোধ, ধারাবাহিক ঐতিহ্যের স্রোত। হিন্দুত্ব মানে হিন্দু ধর্ম নয়।' আরএসএসের সংখ্যালঘু শাখা মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের প্রচারক ইন্দ্রেশ কুমার বলেছেন, 'ভাগবতজীর প্রচেষ্টা উর্দুভাষী মুসলমানদের মূলধারায় আনার এবং দেশগঠনে তাঁদের শামিল করার চেষ্টা।

সুতরাং যাঁরা ভাগবতজীর সমালোচনায় মুখর তাঁদেরও অনুধাবন করতে হবে তিনি আসলে কোনোভাবেই সঙ্ঘের সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার পরিপন্থী পথে হাঁটছেন না। তিনি স্পষ্টতই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কাছে বার্তা দিয়েছেন, যাঁরা মনে করেন মুসলমানরা ভারতীয় নন, তাঁরা নিজেরাই তাহলে হিন্দু বলে পরিচয় দেবার যোগ্য নন। কারণ এই বিভেদকামী মনোভাবই সঙ্ঘের আদর্শের পরিপন্থী।

সাধারণভাবে জনগণের একাংশ যাঁরা প্রকৃত অর্থেই ধর্মীয় চিন্তাধারায় নিরপেক্ষ বা যত মত তত পথের আদর্শে বিশ্বাসী তাঁদের মধ্যে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বিরুদ্ধ মতামত ভেসে আসছে। এর মূল কারণ হলো, গোটা দেশ জুড়ে মুসলমান জনশক্তির বাড়বাড়ন্ত। সরকারি হিসেবেও হিন্দু বা অন্যান্য ভারতীয়দের তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার চোখ কপালে তোলার মতো। বিশ্বের বহু চরমপন্থী জিহাদি ও জঙ্গি মুসলমান সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু জনাধিক্যকে পরাস্ত করতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে জোরদার প্রচার চালিয়ে আসছে। শিক্ষার অভাব এবং দারিদ্র্যে পঙ্গু ভারতের মুসলমান সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে এই জিহাদি শক্তিগুলি প্রতিদিন হিন্দু বিরোধী দাঙ্গায় লিপ্ত করতে উস্কানি দিয়ে চলেছে। ফলে মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয়ে অপরাধের পথে পা বাড়াচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে গত ৫৩ বছর ধরে ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তির শাসন চলছে (প্রথমে যুক্তফ্রন্ট তারপর বামফ্রন্ট এবং এখন তৃণমূল) সেখানে সংখ্যালঘু অপরাধের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত। সরকারি হিসেবেই তার প্রমাণ মেলে। রাজ্য সরকারগুলি এ রাজ্যে এতদিন ধরে এই অপরাধীদের প্রশ্রয় দিয়ে আসলে এদের যতটা না হিন্দুবিরোধী করে তুলছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষের বক্তব্য, সঙ্ঘকে বিশেষ কয়েকটি রাজ্যে তাই বিশেষভাবে প্রচার চালাতে হবে যাতে রক্ষণশীল হিন্দুরা বিভ্রান্ত এবং ধৈর্য্যহারা না হন। আবার মুসলমান পরিবারগুলিও ভুল এবং মিথ্যা প্রচারের শিকার না হন। আরএসএস নেতৃত্বকে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে কারণ এ রাজ্যে প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান তোষণের ও সঙ্ঘের বিরোধী সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তাই এ রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে এক চরম বিপদসীমায়। বিশেষ করে এ রাজ্যে অবিরাম সরকারি প্রশ্রয়ে চলছে বিদেশি (প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মুসলমান) অনুপ্রবেশ। এই অনুপ্রবেশের শরিক জঙ্গিরাও যাঁরা ভারতবর্ষের শিকড়ে আঘাত হানতে চায়। সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আরও সজাগ ভূমিকা নিক— পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ এটাই চায়।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নন। হিন্দুরাও নন। মুসলমানরাও নন। কিন্তু রাজনৈতিক অপকর্ম এ রাজ্যের মানুষকে সাম্প্রদায়িক করে তুলছে। বিশেষ করে গত দশ বছরে এই অশুভ ইঙ্গিত বোঝা যাচ্ছে রাজ্য জুড়ে। রাজ্যের মানুষ চান— অবিলম্বে রাজ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা ফেরাতে, হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদ ঠেকাতে এবং হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়ার মনোভাবকে সক্রিয় করে তুলতে মোহন ভাগবতজী বিশেষ উদ্যোগ নিন। তাতে গোটা দেশই উপকৃত হবে।

(লেখক প্রাক্তন সাংবাদিক এবং গবেষক)

ডিএনএ কোডিঙে প্রমাণিত আর্য আক্রমণতত্ত্ব মিথ্যা

চন্দ্রচূড় গোস্বামী

'The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.'
—George Orwell

ভারতবর্ষে মেকলে দ্বারা পরিকল্পিত এবং স্যার মর্টিমার উইলারের মস্তিষ্কপ্রসূত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিভেদকামী একটি তত্ত্ব হলো 'আর্য অনুপ্রবেশ তত্ত্ব'। এই তত্ত্বের মূল উপপাদ্যটি হলো— ভারতবর্ষের ফর্সা, সুন্দর ও লম্বা মানুষেরা যারা মূলত উত্তর ভারতীয় তাদের পূর্বপুরুষরা আর্য এবং তারা অনুপ্রবেশকারী। তারা মূলত মধ্য এশিয়া ও পূর্বইউরোপীয় অঞ্চল থেকে এসেছে। ভারতের কৃষ্ণকায় ও খর্বাকার ব্যক্তিরা যারা মূলত আর্যদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তারা অনার্য বা দ্রাবিড়, তারাই এই দেশের ভূমিপুত্র বা মূলনিবাসী। যুগের পর যুগ ধরে আর্যরা অনার্যদের হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও নরসংহার করে এসেছে। বিদেশি ইংরেজরা খুব সুচতুর ভাবেই এই মিথ্যে 'আর্য বহিরাগত' তত্ত্বের অবতারণা করেছিল। উদ্দেশ্যটা খুব স্পষ্ট। প্রথমত তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে ভারতীয়দের নিজস্ব কোনো সভ্যতা ছিল না। যা কিছু ছিল তা আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগেই আর্যদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে অধুনা ভারতে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যে নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় তা মূলত বহিরাগত আর্যদের অবদান।

দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষে যুগের পর যুগ ধরে বহিরাগত শত্রুদের আক্রমণ হয়েছে। আর এইসব বহিরাগত লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী জাতীয়তাবাদী ভূমিপুত্ররা রুখে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের বার্তা দেওয়া যে তোমাদের পূর্বপুরুষরাও একইরকম লুণ্ঠনকারী ও বহিরাগত। ফলে এই দেশ বা মাটি যেমন আমাদের নয়, তোমাদেরও নয়।

তৃতীয়ত, উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে 'Devide and Rule' নীতির মাধ্যমে চিরস্থায়ী বিভেদ তৈরি করা যাতে ভারতীয়রা কোনোদিন সনাতনী জাতীয়তাবাদী আদর্শে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে। ঔপনিবেশিক ইংরেজদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করলেন রমিলা থাপার, ইরফান হাবিবদের মতো কমিউনিস্ট শিক্ষাবিদরা। তাঁরা কোনোরম তথ্য প্রমাণ ছাড়াই এই কাল্পনিক তত্ত্বকে ভারতবর্ষের পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করলেন।

এতদূর সব ঠিকই ছিল, কিন্তু বাধ সাধল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে হরিয়াণার হিসার জেলার অন্তর্গত 'রাখিগড়ি' সাইটে আবিষ্কৃত একটি মহিলার কঙ্কাল। 'I৬১১৩' শীর্ষক কঙ্কালটির জীন ম্যাপিং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করলেন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রফেসার বসন্ত সিন্ডে, বিজ্ঞানী ড. নিরজ রাজ ও প্রখ্যাত জীনতত্ত্ববিদ ডেভিড্ রীচ্। তাঁরা প্রমাণ করে দেখালেন যে ভারতীয় উপমাহাদেশের মানুষদের 'ডিএনএ' Coding সম্পূর্ণ 'unique' এবং তার সঙ্গে মধ্য এশিয়া বা পূর্ব ইউরোপের যে অংশ থেকে আর্যরা এসেছে বলে দাবি করা হয় সেই অঞ্চলের মানুষদের 'ডিএনএ কোড'-এর কোনো মিল নেই। ফলে স্যার মর্টিমার উইলার বা রমিলা থাপারদের বক্তব্য সারবত্তাহীন আষাঢ়ে গল্প মাত্র।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের সঙ্গে ইরান বা তৎকালীন ব্যাবিলন-মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের মানুষদের ডিএনএ ১১ শতাংশ মিলে গেল। এর থেকে প্রমাণিত হয় ইউরোপীয়রা ভারতীয়দের চাষবাস শিখিয়েছে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অন্তঃসারশূন্য। কারণ সেক্ষেত্রে ১১ শতাংশের বদলে ১০০ শতাংশ ইউরোপীয়দের সঙ্গেই ওই নারীর কঙ্কালের ডিএনএ মিলে যেত। বাস্তবে ভারতীয়রাই যে ওই দেশগুলিতে কৃষিকাজ ও বিজ্ঞানশিক্ষা পৌঁছে দিয়েছে তা এক কথায় নিশ্চিত।

তৃতীয়ত, দক্ষিণ ভারতীয় এবং আন্দামানের প্রান্তিক উপজাতিদের সঙ্গে ওই রাখিগড়ি কঙ্কালের ডিএনএ মিলে যাওয়ার অর্থ হলো এতদিন যাদের দ্রাবিড় বা অনার্য বলে চিহ্নিত করা হতো সেই দক্ষিণ ভারতীয়দের সঙ্গে উত্তর ভারতীয়দের জীনগত তেমন বৈষম্য নেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, সূর্যালোকের তীব্রতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্যের উপর ভিত্তিকরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের মানুষদের গাত্রবর্ণ, শারীরিক গঠন এবং উচ্চতার তারতম্য দেখা যায়। প্রাচীন ভারতে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে যে ব্যক্তিরা নিজেদের আচার আচরণ ও চারিত্রিক মহত্ত্বের জন্য অন্যদের কাছে অনুকরণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো তাদের আর্যপুত্র বা আর্যকন্যা বলে সম্বোধন করা হতো। আর 'দ্রাবিড়' শব্দটি অতীতে 'ত্রবিদ্' শব্দটির অপভ্রংশের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এখানে 'ত্রবিদ্' বলতে তিনটি উপকূল যুক্ত ভূভাগ বা দক্ষিণ ভারতকে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ অতীত ভারতে 'আর্য' ও 'দ্রাবিড়' কোনো শব্দই জাতিসত্ত্বাকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রফেসার বসন্ত সিন্ডে, বিজ্ঞানী ড. নিরজ রাজ ও প্রখ্যাত জীনতত্ত্ববিদ ডেভিড্ রীচ্ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে ভারতীয় উপমাহাদেশের মানুষদের 'ডিএনএ' Coding সম্পূর্ণ 'unique' এবং তার সঙ্গে মধ্য এশিয়া বা পূর্ব ইউরোপের যে অংশ থেকে আর্যরা এসেছে বলে দাবি করা হয় সেই অঞ্চলের মানুষদের 'ডিএনএ কোড'-এর কোনো মিল নেই।

শাওন কে ঝুলে থেকে আজকের ঝুলনযাত্রা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

রাধাকৃষ্ণ লীলার একটি তরঙ্গ ঃ

আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে ধ্বনিত হিন্দুর যে কোনো কল্যাণ ও হিত কামনা। ব্যক্তিগত অথবা সর্বজনীন সমষ্টিগত কিংবা সম্প্রদায়ভিত্তিক যে-কোনও অনুষ্ঠানই হোক, শেষে থাকে বিশ্বজয়ের সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি কামনা। সে কারণেই দোলযাত্রার পর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব ঝুলনযাত্রার অন্তর্নিহিত সুরটিও শেষ পর্যন্ত বিশ্বের শুভবোধের সুরে মিলে মিশে এক অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করে।

রাধাকৃষ্ণের লীলারঙ্গেরই একটি তরঙ্গ ঝুলনযাত্রা। শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়া থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত তেরো দিনের এই ঝুলন উৎসবে বৈষ্ণবরা মেতে থাকেন রাধাকৃষ্ণের বিশেষ পূজাপাঠ, কীর্তন এবং হরিনাম সংকীর্তনে। পূর্ণিমার দিন রাধাকৃষ্ণকে দোলায় বসিয়ে দোল দিতে দিতে তাঁরা স্মরণ ও মননে অনুধ্যান করেন বৃন্দাবনবিহারী শ্যামসুন্দর এবং শ্রীরাধিকার দেহাতীত প্রেমলীলার কথা। তদ্‌গত চিত্তে আস্বাদন করেন সেই লীলারস। ব্রজভূমি বৃন্দাবন এবং মথুরা, বঙ্গের মায়াপুর সহ বিভিন্ন জায়গাতেই মঠে মন্দিরে আয়োজন হয় এই লীলা উৎসবের। একই সঙ্গে অনেকে ব্যক্তিগত মন্দিরেও ভক্তজন মদনমোহন রাধাকৃষ্ণের বিশেষ পূজা ও কীর্তনে বিভোর হন। প্রসাদ গ্রহণে সকলকে আপ্যায়িত করে ধন্য হন। একাত্ম হন সকলের সঙ্গে।

সকলের উৎসব :

এতো গেল ঝুলন পূর্ণিমার ধর্মাচরণের দিকটা। কিন্তু এই উৎসব কেবলই ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। এরসঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আর্থ-সামাজিক জীবনধারার বিষয়টিও। আর এই কারণেই এই বিশেষ অনুষ্ঠানের বৈদিক-পৌরাণিক বা বিশেষ বৈষ্ণবীয় আচার-অনুসঙ্গে মিশে রয়েছে লোকজীবনেরও নানা বিষয়। এই উৎসব বাধা নয় কোনো বিধিনিষেধ বা শাস্ত্রীয় নির্দেশের বিষয়ে। দোল যাত্রার মতোই ঝুলন যাত্রাতেও যোগ দিতে পারেন যে কোনো ধর্মের বর্ণের মানুষ। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই শামিল হতে পারেন এই উৎসবে। উৎসবের শেষ দিনে রাখি বাঁধার মাধ্যমে শুধু সহোদর-সহোদরাই নয়, আপন-পর নির্বিশেষে সকলেই পরমাত্মীয়তার প্রবাহে সৌভ্রাতৃত্বের এক আন্তরিক এবং অভূতপূর্ব নিদর্শন স্থাপন করেন। এর মধ্য দিয়েই ধর্মের সব বেড়া ভেঙে বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক সুখ-শান্তির মঞ্জিল গড়ে ওঠে।

উৎস : ঝুলন উৎসবের উৎসের শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে পাঁচ হাজার বছরেরও আগের ভারতে। পাশ্চাত্যধারায় ঐতিহাসিকরা মহাভারত এবং পুরাণগুলির যে কালনির্ণয় করেন তারই নিরিখে ঝুলন শুরুর এই কাল নির্দেশ। যদিও ভক্তের ধ্যানধারণায় পার্থিব ব্রজভূমি নয়, মনই হল বৃন্দাবন। সেইখানেই নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট রয়েছেন রাধা এবং কৃষ্ণ। তাঁদের সেই নিত্যলীলারই রস আস্বাদন করেন ভক্ত সাধকরা।

ঝুলনের কথা আছে ভাগবত, হরিবংশে। বৈষ্ণবীয় স্মৃতিশাস্ত্র হরিভক্তি বিলাসে রয়েছে ঝুলন-যাত্রা উৎসব পালনের নানা আচরণবিধির কথা।

পুরা কাহিনি : ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের কাহিনি, দ্বাপর যুগে ব্রজভূমি বৃন্দাবনে ধর্মসংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ বাল্যেই মেতেছিলেন নানা লীলারঙ্গে।

একটি কাহিনি। বৃন্দাবনে শ্রীরাধা প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন তাঁর বারো বছর বয়সে। শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন সাত। অলৌকিক আধ্যাত্মিক প্রেমে মাতোয়ারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী বালকরা শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বেই বৃন্দাবনে যেতেন গোচারণে। নানা বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত প্রাকৃতিক পরিবেশে শ্যামল সতেজ তৃণভূমিতে গরুর পালকে চরতে দিয়ে গোপবালকরা

মেতে ওঠে নানা ক্রীড়ারঙ্গে। তাদের সেই রঙ্গে মাতেন শ্রীমতী রাধা এবং তাঁর সখিরাও।

শ্রাবণের বর্ষণ মুখরিত এমনই এক দিনে মত্ত সকলে এক নতুন খেলায়। কদম গাছের ডালে টাঙায় তারা একটি দোলনা। তাতে পাশাপাশি বসায় ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ এবং গৌরী শ্রীমতী রাধাকে। পরমানন্দে দিতে থাকে দোল। নবঘন মেঘে আচ্ছাদিত আকাশে মাঝে মাঝেই বিজলী চমক। তারই মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মনে হচ্ছিল অঞ্জনঘন অম্বরে যেন স্থির সৌদামিনী। এই 'শাওনকে ঝুলে' খেলাকে স্মরণ করেই বৈষ্ণবীয় উৎসব ঝুলন।

প্রসঙ্গত, দোল এবং ঝুলন এই দু'টি পূজা উৎসবেই রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ বা নারায়ণ শিলাকে মন্দির থেকে এনে বসানো হয় বিশেষ মঞ্চে সুসজ্জিত দোলায়। সে ভাবেই করা হয় পূজার্চনা। এই যে মন্দির থেকে বাইরের মঞ্চ বা মন্দিরে গমন তার থেকেই এই দুই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাত্রা শব্দটি।

হরিভক্ত বিলাসের বর্ণনা এরকম। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ ধরণী। বাতাসেও যেন আগুনের ছোঁয়া। সেই পরিবেশে শ্রান্ত রাধাকৃষ্ণ। সেই শ্রান্তি দূর করতেই ভক্তবান্ধবরা আয়োজন করে নৌকা বিহারের। রাধাকৃষ্ণের দাহ নিরসনে তাঁদের অঙ্গে লেপন করে চন্দন। চামর ব্যজনে তাঁদের দেহ করে শীতল। সেই ধারা অনুসরণেই আজও যুগলবিগ্রহকে শোভাযাত্রা সহকারে বিশেষ মন্ডপে এনে করা হয় পূজা। দোলায় দেওয়া হয় দোল। এইভাবে সুসজ্জিত, নানা রত্নাভরণ ভূষিত বিগ্রহের পূজা হয় তের দিন। তারপর পূর্ণিমায় রাখিবন্ধনের মধ্য দিয়ে হয় উৎসবের সমাপ্তি।

কেকা রবের তাৎপর্য : আকাশে মেঘ। সবুজে সবুজ বৃন্দাবনভূমি। কেকা ধ্বনিতে মুখরিত চারিদিক। তারই মধ্যে যুগল। বৈষ্ণব আচার্যরা এই 'কেকা' রবের এক অপরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন 'কে' এবং 'কা' বর্ণের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে কেকা শব্দটি। এ যেন শুধু ময়ুরের ডাক নয়, এক দর্শন।

এখানে 'কে' হল প্রশ্নবোধক। যেন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, বৃন্দাবনে কোন পুরুষের এমন আশ্চর্য কাজটি করার ক্ষমতা রয়েছে? শ্রীরাধার মান অর্থাৎ অভিমান লজ্জা এবং ধৈর্য তো সুউচ্চ পর্বতের মতো। কে অর্থাৎ কোন পুরুষ সেই পাহাড়কে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারেন। উত্তর, তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

'কা'-এর অর্থ ব্যাখ্যায় তারা বলেন, কোন নারী এমন আশ্চর্য কাজটি করতে পারেন? উত্তরে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হলেন প্রকাণ্ড এক পাগলা হাতি। কেউ তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কেবল একজনই তাঁর 'মান' দিয়ে সেই পাগলা হাতিকেও নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে তাকে প্রেমের শেকলে বেঁধে ফেলেন। তিনি আর কেউ নন—তিনিই শ্রীমতী রাধা।

বৃন্দাবনের বনে বনে কেকা ধ্বনিতে তাঁদের সেই প্রেম মাহাত্ম্যর কথাই ধ্বনিত হয় আকাশের ঘন মেঘ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে।

আরেক কাহিনি। শ্রীমতী রাধা রয়েছেন 'যাবত'-এ শ্বশুর বাড়িতে। তাঁকে বাপের বাড়ি 'বর্ষণা'-য় নিয়ে যাওয়ার জন্য আসার কথা ভাই শ্রীদামের। শ্রাবণের শুক্লপক্ষের দিনগুলি প্রায় কেটে যায়—শ্রীদাম আর আসেন না। শ্রীমতী রাধাও বাপের বাড়ি গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল। অবশেষে পূর্ণিমার দিন আসেন শ্রীদাম। রাধার শাশুড়ি জটিলাকে নানা উপহারে সন্তুষ্ট করে শ্রীমতী রাধাকে নিয়ে আসেন বর্ষণা অর্থাৎ ব্রজধামে। সেখানে এসেই শ্রীমতী রাধা মিলিত হন সখিদের সঙ্গে, যান শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

শ্রাবণ ধারায় সুস্নাত কদম্ব বনে মিলিত হলেন রাধা ও কৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের সেই যুগলমূর্তি সখিদের ভরিয়ে দেয় এক অনির্বচনীয় আনন্দে। তাঁদের দোলনায় বসিয়ে দোল দিতে দিতে সখিরা হন সংগীত-মুখর। তাই ঝুলন আবার প্রিয়া মিলনের উৎসব। উৎসব সংগীতের।

শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের ঝুলন : ঝুলন উৎসব পালিত হয় শ্রীক্ষেত্র পুরী ধামেও। এখানে ঝুলন জগন্নাথ দেবের। শ্রাবণের শুক্লাদশমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত সাতদিন।

পুরীতে জগন্নাথের ঝুলনে শ্রীমন্দির থেকে জগন্নাথ, তাঁরই প্রতিভূ হিসেবে আনা হয় মদনমোহন, লক্ষ্মীদেবী এবং বিশ্বধাত্রীকে। মুক্তিমণ্ডপে দোলনায় বসান হয় এই ত্রি-মূর্তিকে। যথারীতি হয় পূজা অর্চনা। এখানে পূর্ণিমার দিনটি পালিত হয় বলভদ্রের আবির্ভাব দিবস হিসেবে।

এ এক লোক উৎসব : অনেকের অনুমান ঝুলন একটি লোক উৎসব। লোকজীবন থেকে নেওয়া— এমনও অভিমত অনেকের। তাঁদের মতে, এটি হল রাখাল বালক বা গোপ সম্প্রদায়ের একান্তই নিজস্ব অনুষ্ঠান। পরবর্তীকালে বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে এটি অন্যরূপ পায়। তারও পরবর্তী বা সমকালেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি অংশ এই উৎসবকে তাঁদের সাম্প্রদায়িক পূজানুষ্ঠানে পরিণত করেন। তাঁদের বক্তব্য, গাছের ডালে দোলনা ঝুলিয়ে দোল খাওয়াটা প্রান্তিক বা সাধারণ জনগোষ্ঠীর একটি অত্যন্ত প্রিয় খেলা। সেই খেলা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হলেও এই উপলক্ষ্যে যেসব নাচগান ইত্যাদি হয় তাতে লোকজীবনের বৈশিষ্ট্য এবং প্রভাব স্পষ্ট।

ঝুলনকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন লোকশিল্পের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে মানুষের। ঝুলনের মেলার কথা বাদ দিলেও বাড়িতে বাড়িতে বিশেষ করে ছোটো থেকে কিশোর-তরুণদের ঝুলন সাজাবার ক্ষেত্রেও মেলে স্বকীয়তার পরচয়। পাহাড় তৈরি থেকে বিভিন্ন ধরণের পুতুল, গাছপালা, হরেক হস্তশিল্প দিয়ে এই ঝুলন সাজায় তারা। এইভাবে ঝুলন তাদের মধ্যে এক ধরনের সৌন্দর্যবোধও গড়ে দেয়। ভবিষ্যতের বহু শিল্পীরও হাতে খড়ি হয় এই ঝুলন সাজাবার মধ্য দিয়ে। বিকাশ ঘটে নানা উদ্ভাবনী শক্তির। স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। ঝুলন সাজাবার নানা জিনিস কিনতে পাওয়া যায় দোকানে। বেশিরভাগ সময়ই স্থানীয় শিল্পী কারিগররাই এইসব সামগ্রী তৈরি করে। তাই সামান্য হলেও স্থানীয় অর্থনীতিতেও এক ধরণের প্রভাব ফেলে এই ঝুলন। অর্থাৎ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান কেবলই পূজা এবং আচার সর্বস্ব না হয়ে সমাজজীবনকে পুষ্ট আর সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রেও একটা বড়ো ভূমিকা নেয়। ঝুলনের মেলা অথবা বাড়ি বাড়ি যে ঝুলন হয় তা দেখার ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ থাকে না। সকলেরই সেখানে অবারিত দ্বার। তারই ফলে ঝুলন কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সকল অর্থেই সর্বজনীন শুভ উৎসবে পরিণত হয়েছে।

(ঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

হাজার মনের একটি বাঁধন

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। আমেরিকার চিকাগো ধর্মসম্মেলনে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র ৩ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডের যে ছোট্ট ভাষণটি দিয়েছিলেন তার প্রথম সম্বোধনটি ছিল— 'Sisters and brothers of America'। তা শুনে সেদিন হলে উপস্থিত সাত হাজার দর্শক মুগ্ধ বিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু' মিনিটেরও বেশি করতালিতে মুখরিত করেছিল কলম্বাস হল। এ কী এমন শব্দ যা বিশ্ববাসীকে চকিত করেছিল? এ তো আমাদের কাছে বিশেষ কোনো সম্বোধন নয়। সাধারণত আমরা একে অপরকে প্রথম সাক্ষাতে ভাই বা বোন বলে সম্বোধন করেই থাকি, তবে কেন এই উচ্ছ্বসিত অভিবাদন?

এর কারণ, পাশ্চাত্যের কোথাও কোনো অনাত্মীয় ব্যক্তিকে প্রথম দর্শনে নিজের সহোদর বা সহোদরা বলে সম্বোধিত করার সংস্কৃতি নেই। ভারতীয় ছাড়া বিশ্বে অন্য যতগুলি মত ও পথ আছে তারা কেবল নিজের সম্প্রদায়ের মানুষকেই ভাই বলে ডাকতে অভ্যস্ত, অন্য পথের অনুসারীদের নয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়--- খ্রিস্টান ব্রাদারহুডে বিশ্বাসী, ইসলামে বিশ্বাসীরা ইসলামি ব্রাদারহুডে, অন্যরাও তাই। তারা কেউই ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুডে আস্থাশীল নয়। অন্য মতের অনুসরণকারীরা তাদের কাছে হয় 'হিদেন' নয় 'কাফের', সহোদর বা সহোদরা তো কখনই নয়। তাই সেদিন হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামীজীর প্রথম সম্বোধনে তাদের এত বিস্ময়, এত করতালি।

রাখী ভারতবর্ষের এই মমত্ববোধেরই বাহ্যিক প্রকাশ। পৌরাণিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত এদেশে 'রাখিবন্ধন' হলো একে অপরকে ভাতৃভাবে গ্রহণ করার ও তাকে রক্ষা করার অঙ্গীকারের প্রতীক। সংস্কৃত ভাষায় যাকে 'রক্ষা বন্ধন' নামে অভিহিত করা হয়।

সত্য যুগে দৈত্যরাজ বলি ছিলেন পরম বিষ্ণুভক্ত। একবার শত্রু আক্রমণে বলি যখন প্রায় পরাজিত তখন ভক্তকে রক্ষা করতে নারায়ণ বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এলেন বলিরাজ্যে। যুদ্ধে বিজয় হলো বলিরাজের। কিন্তু তিনি বিষ্ণুকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখতে প্রার্থনা করলেন, বিষ্ণুও সম্মত হলেন। এদিকে স্বামী ফিরছে না দেখে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী অবশেষে এক সাধারণ নারীর ছদ্মবেশে উপস্থিত হলেন বলিরাজের কাছে। এবং বললেন— 'তার স্বামী নিরুদ্দেশ, স্বামী না ফেরা পর্যন্ত তিনি আশ্রয়প্রার্থী।' বলিরাজ আশ্রয় দিলেন সেই নারীকে। এক শ্রাবণী পূর্ণিমায় পুণ্য তিথিতে সেই নারী বলিরাজকে ভাই সম্বোধন করে তার হাতে বেঁধে দিলেন একটি সূতোর তাগা বা রাখি। প্রতিদানে বলিও তাকে দিলেন তার সব দুঃখ কষ্ট দূর করার প্রতিশ্রুতি। এবার লক্ষ্মী নিজের রূপ ধারণ করে বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। বলিরাজ মা লক্ষ্মীকে ভগিনী হিসেবে পাওয়ার আনন্দে বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। মা লক্ষ্মী ও বলিরাজের মধ্যে রাখিবন্ধনের ওই পূণ্য দিন, অর্থাৎ শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিটি সেদিন হতে রাখিবন্ধন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। সেই ইতিহাসকে স্মরণে রেখে আজও বোনেরা তাদের ভায়ের হাতে রাখি পরানোর সময় উচ্চারণ করে এই মন্ত্র— 'যেন বদ্ধো বলিরাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ। তেন ত্বাং প্রতিবধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল।' অর্থাৎ বলি রাজাকে যেভাবে রক্ষা মন্ত্রে আবদ্ধ করা হয়েছিল আমিও তোমাকে রক্ষাবন্ধন সূত্রে আবদ্ধ করছি। হে রক্ষাবন্ধন, তুমি অচল থেকো।' আরও কথিত আছে দেবাসুরের যুদ্ধে যাওয়ার আগে দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণীও স্বামীর মঙ্গল ও বিজয় কামনায় তাঁর হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন।

এল ত্রেতা যুগ। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য স্ত্রী সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হলেন। লক্ষ্মণ নিজে

গিয়ে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রেখে এলেন তাঁকে। এখানেই জন্ম হলো রাম ও সীতার দুই পুত্রের। মহর্ষি জন্মের পরেই দুই শিশুর হাতে বেঁধে দিলেন মন্ত্রপুত কুশ ও তাদের নাম দিলেন কুশ ও লব। সেই রক্ষাবন্ধনকে স্মরণে রেখে আজও আমাদের মায়েরা জন্মের পর শিশুর হাতে ও কোমরে সুতোর তাগা বা ঘুমসি বেঁধে দেন মঙ্গল কামনায়।

এরপর এল দ্বাপর। কংসের কারাগারে বন্দি ভগিনী দেবকী ও ভগ্নীপতি বসুদেব। অপরাধ, এক দৈবী আকাশবাণী--- 'রে অত্যাচারী কংস, এদের অষ্টম গর্ভের সন্তান হত্যা করবে তোকে।' ক্ষিপ্ত কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করে রাখলেন। এখানেই একে একে জন্ম হলো দেবকীর সাতটি সন্তানের। সবকটিকেই হত্যা করল কংস। অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। মথুরার সেই পবিত্র ভূমিতে এক মহাদুর্যোগের রাতে, শুভ জন্মাষ্টমীর পূণ্য তিথিতে দেবকীর কোল আলো করে এলেন অষ্টম গর্ভজাত সন্তান— স্বয়ং নারায়ণ। আবার এল দৈব নির্দেশ। কংসের হাত থেকে বাঁচাতে পিতা বসু দেব সদ্যোজাত শিশুপুত্র কৃষ্ণকে রেখে এলেন নন্দরাজার বাড়ি। নন্দপত্নী যশোদা আপন পুত্ররূপে কৃষ্ণকে মানুষ করতে লাগলেন। সেদিন মা যশোদা শিশুপুত্র কৃষ্ণের কল্যাণ কামনায় তার হাতে সুতোর তাগা পরিয়ে রক্ষার সংকল্প করেছিলেন তাও ছিল রাখিবন্ধনের একটি রূপ।

মহাভারতে পাণ্ডব জননী কুন্তী বালিকা অবস্থায় তার আরাধ্য দেবতা সূর্যের বরে কর্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেন। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে শিশু কর্ণকে সন্তান রূপে নিজের কাছে রাখতে অসমর্থ হন। উপায়ান্তর না দেখে শিশু কর্ণকে একটি বড়ো পাত্ররূপী নৌকায় ভাসিয়ে দেন নদীতে। সেদিনও পুত্রশোকে ক্রন্দনরতা কুন্তী কর্ণের মঙ্গল কামনায় তার হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন ভগবানের নামে উৎসর্গ করা সূতোর তাগা বা রাখি। আরও আছে, এক ভীষণ যুদ্ধে কৃষ্ণের ডান হাতের কব্জিতে একবার অস্ত্রের আঘাতে খুব রক্তক্ষরণ হয়েছিল। দ্রৌপদী তা দেখে নিজের শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে সেই ক্ষতস্থান বেঁধে দেন। অভিভূত কৃষ্ণ সেদিন দ্রৌপদীকে আপন ভগিনী বলে সম্বোধন করেন। পরে কপট পাশাখেলায় কৌরবরা বিজয়ী হয়ে রাজসভায় সবার সম্মুখে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে উদ্যত তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করে ভাইয়ের কর্তব্য পালন করেন।

১৫৩৫ সাল, দেশে তখন বিদেশি মোগল শাসন। গুজরাটের সুলতান ছিল বাহাদুর শা। চিতোরের রাজার অকাল মৃত্যুতে চিতোরের রানি কর্ণাবতীর রাজ্য দখলের উদ্দেশ্যে চিতোর আক্রমণ করল সে। অসহায় রানি তখন উপায়ান্তর না দেখে দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে একটি রাখি সম্বলিত পত্র পাঠালেন। পত্রে ভাই সম্বোধন করে সাহায্য প্রার্থনা করলেন রানি। কর্ণাবতীর রাখি পেয়ে অভিভূত হুমায়ুন চিতোর রক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু হায়, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাহাদুর শা রানির দুর্গ দখল করে নিয়েছেন, আর শা-এর সেনাবাহিনীর হাত থেকে সতীত্ব রক্ষায় কর্ণাবতী তের হাজার হিন্দু রমণীকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জহরব্রত পালন করেছেন। রাগে অগ্নিশর্মা হুমায়ুন বাহাদুর শা-কে চিতোরের দুর্গ থেকে উৎখাত করে কর্ণাবতীর পুত্র বিক্রমজিৎকে সিংহাসন ফিরিয়ে দেন। রাখির ইতিহাসে এও এক স্বর্ণজ্জ্বল অধ্যায়।

১৯০৫ সাল, ইংরেজ শাসনকাল। ভারতের রাজধানী তখন কলকাতা। অত্যাচারী ইংরেজ তাড়াতে বাঙ্গলার চরমপন্থী আন্দোলন তুঙ্গে। শাসকের রক্তের নেশায় মেতে উঠেছে বাঙ্গলার যুবক-যুবতী। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কলকাতা, মেদিনীপুর তখন ইংরেজের কাছে ত্রাস। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত বাঙ্গলার আকাশ বাতাস। বাঙ্গলার এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে কুচক্রী লর্ড কার্জন বাঙ্গলাকে ভাগ করার পরিকল্পনা করলেন। বাঙ্গলার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ গর্জে উঠল এর বিরুদ্ধে। শুরু হলো তীব্র আন্দোলন। অনমনীয় কার্জন। বললেন— 'Partition of Bengal is a settle fact'— বাঙ্গলা ভাগ হবেই। ১৬ অক্টোবর, বাঙ্গলা ভাগের বিল কার্যকর করার দিন। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সেদিন অরন্ধন। মেয়েরা ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর আরাধনায় সংকল্প নিচ্ছে— 'মা লক্ষ্মী কৃপা কর। আমাদের বাঙ্গলাকে তুমি ভাগ হতে দিও না।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে সেদিন সাজো সাজো রব। সর্বস্তরের মানুষ সমবেত হলেন কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে। স্নান করে পরস্পর শুরু হলো রাখিবন্ধন। মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে, উলু দিচ্ছে, পথে চলেছে রাখিবন্ধনের শোভাযাত্রা আর মুখে রবি ঠাকুরের গান— 'বন্দে মাতরম্ একই সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি মন।' এই রাখির শক্তিতেই সেদিন সারা বাঙ্গলায় এমন দুর্বার আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, যার প্রতাপে ইংরেজ ১৯১১ সালে Settle fact বঙ্গভঙ্গকে আনসেটেল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় পরাজিত ইংরেজ শাসক লজ্জায় ও ভয়ে ওই বছরই ভারতের রাজধানী কলিকাতাকে দিল্লিতে নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু, হায়, যে ঐক্যের কারণে ১০৫ সালে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কুচক্রী ইংরেজকে আমরা বঙ্গভাগ করা থেকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছিলাম, মাত্র ৪২ বছর পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের অনৈক্য এবং লোভী নেতাদের ক্ষমতা দখলের মোহ খণ্ডিত করল আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে। ভগৎ সিংহ, শুকদেব, রাজগুরুর ফাঁসির মঞ্চ লাহোরের সেন্ট্রাল জেল, মাস্টারদা সূর্যসেনের চট্টগ্রাম, লোকনাথবল-টেগরা বল, নির্মল সেনের জালালাবাদের মাটি, আর প্রীতিলতার পাহাড়তলি আমাদের কাছে হয়ে গেল বিদেশ। কারণ রাখির মহত্ব আমরা অনুধাবন করতে পারিনি।

আমাদের মাতৃভূমি আজ দ্বিখণ্ডিত-ত্রিখণ্ডিত। তবু এদেশকে যাঁরা মা বলে শ্রদ্ধা করেন তাদের চোখে--- 'হিমালয় হতে কন্যাকুমারী গান্ধার হতে ব্রহ্মদেশ'— এক ভারতবর্ষ, অখণ্ড-অবিভাজ্য এক দেশ। কারণ এ কোনো পলিটিক্যাল নেশান নয়, কালচারাল নেশান— সাংস্কৃতিক ভারত। এদেশের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। এই দেবনির্মিত দেশে স্বয়ং ভগবান মানব শরীরে অবতার রূপ ধারণ করে যুগে যুগে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, মহাবীর, নানক, শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে লীলা করেছেন। তাই এ কেবল একখণ্ড ভূমি নয়, এ ধর্মভূমি, ঋষি রবিন্দের ভাষায় 'মৃণ্ময়ী আধারে চিন্ময়ী সত্তা। আমরা এই অখণ্ড ভারতেরই পূজারী। অখণ্ড ভারতের চিন্তানায়ক ঋষি অরবিন্দের পুণ্য আবির্ভাব দিবসও এই মাসে, অর্থাৎ ১৫ আগস্ট। তাই রাখি পূর্ণিমা শুধু হাতে হাতে রাখি বাঁধার দিন নয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম সংস্কৃতির দেশ ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতকে স্মরণ করার দিনও। আমাদের কাছে দিনটি অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবস।

(রাখিপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

ভারতভূমি অতীতের অনেক বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের দাবিদার

ড. শুভময় দত্ত

এককালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা নিছক ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'ব্যাদে সব আছে', আজ কথাটি একধরনের অপব্যবহারে ক্লিষ্ট। বলার সময় হয়েছে 'ব্যাদে সব আছে' কথাটি যেমন হাস্যকর বা গ্রহণীয় নয়, তেমনই 'ব্যাদে' কিছু নেই এরকমটা ভাবাও হাস্যকর। এখানে মনে রাখা দরকার স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ৮-১০ বছর আগে ড. মেঘনাদ সাহা ও অনিলবরণ রায়ের বিতর্কটিতে যার সূত্রপাতে ঘটেছিল ১৯৩৯ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে। 'এক নতুন জীবনদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক সাহা ভারতবর্ষের তৎকালীন সমাজ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শিল্পের বিকাশ, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা লিখেছিলেন। অনিলবরণ রায় এ নিয়ে সমালোচনা করেন যা প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। সে সমালোচনার উত্তর মোট চার কিস্তিতে ড. সাহা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সৃষ্টি হয় 'সব ব্যাদে আছে' বিতর্ক। সমালোচনার উত্তরের দ্বিতীয় পর্বে ড. সাহা বলেন, 'অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি বেদের প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। এই বাক্যটির প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বেকার কথা, আমি তখন বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইয়াছে। ঢাকা শহরনিবাসী (অর্থাৎ আমার স্বদেশবাসী) কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠি উকিল আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি জানিবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। আমি প্রথম জীবনের উৎসাহ ভরে তাঁহাকে আমার তদানীন্তন গবেষণা সম্বন্ধে (অর্থাৎ সূর্য ও নক্ষত্রাদির প্রাকৃতিক অবস্থা যাহা Theory of lonisation of Elements দিয়া সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়) সবিশেষ বর্ণনা দিই। তিনি দুই-এক মিনিট পর পরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন— এ আর নতুন কী হইল, এ সমস্তই ব্যাদে আছে। আমি দু-একবার মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম— মহাশয়, এসব তত্ত্ব বেদের কোন অংশে আছে, অনুগ্রহপূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি? তিনি বলিলেন— আমি তো কখনও ব্যাদ পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবি কর সমস্তই ব্যাদে আছে।' এই কারণে হয়তো ড. মেঘনাদ সাহা বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী হয়েও ব্যক্তিগত খারাপ লাগা থেকে এরকম মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ বিষয়টি না জেনেই কিছু বিজ্ঞানমনস্ক লোক ভারতীয় বিজ্ঞানকে নিয়ে অনেক নিম্নধারণা পোষণ করেন ও তার প্রচার করেন। তাই নিরপেক্ষ বিচারের প্রয়োজন।

আর্যভট্ট

বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশ্লেষণ বা ইতিহাসে বিজ্ঞানের ভূমিকা ও অবস্থান নির্ণয়— বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে, আমাদের দেশে তো বটেই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা বা পুস্তক যথেষ্ট কম। যেটুকু আলোচনা হয়েছে, তার আবার অধিকাংশই বিজ্ঞান প্রযুক্তির লোকের দ্বারা লিখিত নয়। প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রথা ভেঙে লিখেছেন, 'history of Hindu Chemistry' আকর গ্রন্থটি। ইংল্যান্ডের জে. ডি. বার্নাল ছিলেন একজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ (তাঁর ছয় জন ছাত্র নোবেলবিজয়ী)। তিনি লিখেছেন পৃথিবীবিখ্যাত পুস্তক 'Science in History' (চার খণ্ডে)। লক্ষণীয় যে, বার্নাল কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহস লেখেননি, লিখেছেন ইতিহাসে বিজ্ঞানের কথা। বার্নাল লিখেছেন তাঁর পুস্তকের শুরুতে, 'বিজ্ঞানীদের ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিদের অতি ক্ষুদ্রাংশ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক কার্যক্রমকে অধ্যয়ন করেছেন। বিজ্ঞানের কাজের ফসলগুলি চলতি বিজ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তবে আদিকে কবর দিয়ে' (১ম খণ্ড)।

ইতিহাসবিদ মার্ক ব্লকের কথায় ইতিহাস হলো 'সময়ে মানুষের বিজ্ঞান'— Science of Man in Time। ইতিহাস মানে শুধু কিছু ঘটনার বিবরণ নয়, ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিত তাৎপর্য, অভিঘাত বিশ্লেষণও। যা থেকে সময়ের বিবর্তন বোঝা সম্ভব। প্রাচীনকালের ইতিহাস অতি দুরূহ কোনো ঘটনার লিখিত বিবরণ বহুলাংশে ছিলই না, কখনো থাকলেও এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। কোনো বিষয়ে সরাসরি এমন কোনো কিছু না পাওয়া গেলে অবস্থাগত প্রমাণ দেখে প্রমাণ করতে হয়। অতীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রমাণাদি থেকে অতীতের বিষয়ে না পাওয়া প্রমাণ সম্পর্কে অনুমান করতে হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হাত ধরাধরি করে চলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমাজসম্পৃক্ততার কারণেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস, তাৎপর্য, অবদান ও প্রভাবকে বুঝতে গেলে কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কতগুলো সূত্র জানলে হবে না, জানতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সামাজিক প্রেক্ষাপটকে, সেই সময়ের

রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্রকে।

আমাদের ভারতবর্ষের অনেক কিছুই বহু বিজ্ঞানীকে বিস্মিত করে। সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হলো তার নগর সভ্যতা। ৯×৩৪ ফুট চওড়া রাস্তা উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে সোজাসুজি সমকোণে ছেদ করে চলে যাচ্ছে। বাড়ি, শস্যাগার, যৌথ স্নানাগার পরিকল্পিত ভাবে স্থাপিত। এ তো বিজ্ঞানেরই নিদর্শন। জলসম্পদ পরিচালনায় ভারত বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। বেদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জল পঞ্চভূতের একটি। জীবনধারণের প্রয়োজনে শুধু নয়, কৃষিকাজের ও গার্হস্থ্য প্রয়োজনের জলের উৎস সন্ধান থেকে জলের ব্যবস্থাপনা প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় কথাও বিভিন্ন শ্লোক, ব্যাখ্যাকারদের টীকা ভাষ্যের মধ্যে এসেছে। ঋক্‌বেদে জলসম্পদের উৎস খোঁজার কথা বলা হয়েছে ২.১১.১২ সূত্রে। ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থান চিহ্নিত করার কল্পনা করা হয়েছে। যদিও এগুলি প্রাথমিক পর্যায়ের চিন্তা। কারণ ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন আধুনিক পদ্ধতিতে করতে গেলে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দরকার অর্থাৎ 'Fluid Mechanics', 'Hydraulics', 'Geotechnical Engineering'-র জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরির ধাতুপ্রযুক্তি তখন জানা ছিল না। তবু ৩০০০ বছর আগে এসব যে তাঁদের চিন্তার স্তরে এসেছিল তার প্রমাণ আছে। এই একটি প্রবন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানের সমস্ত ইতিহাসের ধারাটি বলা সম্ভব নয় কিন্তু আমাদের খুব নিরপেক্ষভাবে বুঝতে হবে যে, গণিতের ইতিহাসের ধারায় যেমন অনেক বেশি গভীর বা প্রগাঢ় যুক্তি পাব হয়তো অন্য শাখার বিজ্ঞানে সে রকমটি নাও পেতে পারি। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেটি কতটা উন্নত ছিল তা দেখার চেষ্টা করা উচিত সকলের। গণেশের Plastic Surgery, রাবণের বোয়িং বিমান বা ধৃতরাষ্ট্রের ইন্টারনেটের দাবি যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনই 'Bakshali' পাণ্ডুলিপিতে শূন্যের উল্লেখ; আর্যভট্টের ত্রিকোণমিতি, পিঙ্গলের ছন্দ : সূত্র; পিঙ্গলের সমবায় গণনার ভাবনা বা আধুনিক যুগে বিশ্ব যাকে Fibonacci Sequence (ফিবোনাচ্চি অনুক্রম) নামে চেনে তার উল্লেখ বিরহাঙ্কের কাজে (৭৩০এডি) বা পরবর্তী সময় হেমচন্দ্রের (১১৫০এডি) কাজে সেগুলি উল্লেখযোগ্য ভাবে সূক্ষ্ম গণনা পদ্ধতির দাবি রাখে।

গণিতের ইতিহাসে প্রাচীন ভারতবর্ষের অবদান 'শূন্য' কথাটি খুব মজার শোনালেও আজ তা সারা পৃথিবীতে মোটের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃতও বটে, যদিও এর উৎপত্তির সময়কাল আজও যথেষ্ট তর্কসাপেক্ষ ও কৌতূহল জাগানো। এখানে একথা বলে রাখা দরকার কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে শূন্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রাচীন গ্রিস বা চীনে কিন্তু সাধারণভাবে এই মতকে Minority View বা সংখ্যালঘুদর্শন বলে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানমহল গণ্য করে। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানচর্চার মাধ্যম ছিল 'শ্রুতি' অর্থাৎ গুরুগৃহে গুরুর কাছে বসে তা শুনে মনে রাখা। এই ভাবে জ্ঞানধারা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত। জ্ঞানচর্চার এই ভাণ্ডার মোটের ওপর দু' ধরনের চরিত্র বৈশিষ্ট্যে বিভাজিত— পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। গণিতের উল্লেখ রয়েছে অন্যতম অপরাবিদ্যা হিসেবে মুণ্ডক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে। প্রাচীন আর একটি গ্রন্থের নাম বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। এই বেদাঙ্গ জ্যোতিষে আমরা দেখতে পাই গণিত শাস্ত্রের সর্বোচ্চ গুরুত্বের উল্লেখ—

'যথা শিখা ময়ূরানাং নাগানাং মণয়ো যথা
তদ্‌বদ্ বেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাম্ গণিতং মূর্ধনি স্থিতম্।।'

অর্থাৎ ময়ূরের মাথার উপর যেমন শিখা যা নাগের মাথার মণির মতো, ঠিক তেমনি সমস্ত বেদাঙ্গ শাস্ত্রের মধ্যে গণিতের স্থান সবচেয়ে উঁচুতে। বৈদিক যুগের গণিতচর্চার সবচেয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থসম্ভার যা গবেষকদের জানা রয়েছে তা চরিত্রগতভাবে জ্যামিতিক। যজুর্বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও শাস্ত্র পরিচয়ের ঘরানায় এই রচনা 'শুল্বসূত্র' নামে পরিচিত। শুল্ব শব্দের অর্থ হলো— পরিমাপক দড়ি। ইতিহাসের কোনো এক আদি পর্যায়ে যার সূচনা হয়েছিল অঙ্গুলি গণনার মাধ্যমে, তার স্পষ্ট বিকাশ ঘটেছিল বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে। বৈদিক শাস্ত্রের শুল্বসূত্রগুলির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল গণিত শাস্ত্রের কয়েকটি বিশেষ শাখা। গণিতশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয়দের অবদান সম্বন্ধে অবহিত হবার অবকাশ রয়েছে শুল্বসূত্রে। বিশেষ করে জ্যামিতির প্রবর্তনে বৈদিক ঋষিদের অবদান উল্লেখযোগ্য। বেদি নির্মাণে সুতো বা দড়ির সাহায্যে মাপজোখ করা হতো। আর যাঁরা দড়ি নিয়ে মাপজোখ করে বেদি নির্মাণ করতেন, তাঁদের বলা হতো শুল্ববিদ। খ্যাতনামা শুল্ববিদ ছিলেন বৌধায়ন, কাত্যায়ন ও আপস্তম্ভ। বৌধায়ন শুল্বসূত্র সবচেয়ে পুরোনো। সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৫০০ অব্দ। অনেকের মতে সময়কাল ছিল আরও প্রাচীন (খ্রিস্টপূর্ব ৮০০-৬০০ অব্দ)। আপস্তম্ভ শুল্বসূত্রের সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০-৪০০ অব্দ ও কাত্যায়ন শুল্বসূত্র খ্রিস্টপূর্ব ৪০০-৩০০ অব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শুল্বসূত্রগুলিতে বিভিন্ন ধরনের বেদি ও তাদের নির্মাণ পদ্ধতির উল্লেখ আছে। আকৃতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বেদিগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হতো। যথা— অগ্নিবেদি, মহাবেদি, শ্যেনবেদি, রথচক্রবেদি, দ্রোণবেদি (বর্গাকার), কাম্যবেদি, শ্মশানবেদি (বর্গ, বৃত্ত বা ট্র্যাপিজিয়াম) প্রভৃতি। আবার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বেদিগুলি নির্মিত হতো।

বৌধায়ন বর্গ থেকে রূপান্তরিত বৃত্তের ক্ষেত্রফল গণনা করতে গিয়ে একটি অনুপাতের মান খুঁজে পান। সেদিন এই বেদজ্ঞ ঋষির কোনো ধারণাই ছিল না যে তাঁর আবিষ্কৃত এই সংখ্যাটি পরবর্তীকালে 'π' ধ্রুবক হিসেবে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। দীর্ঘদিন পরে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক আর্কিমিডিস 'π'-র মান গণনা করেন। পরবর্তীকালে পঞ্চম শতাব্দীতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভারতীয় গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট 'π'-এর মান গণনা করেন। আর্কিমিডিসের প্রচেষ্টাকে বিশ্বের বিজ্ঞ সমাজ পূর্ণ মর্যাদা দিলেও তাঁর জন্মের তিনশো বছর আগে বৈদিক শুল্ববিদদের অবদান অনস্বীকার্য। শুল্বসূত্র, ছন্দ:সূত্র ও তৎকালীন অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে আর্যঋষিদের গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার প্রারম্ভিক সূচনার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল বৈদিক যুগে যা আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ প্রতিভাবান ভারতীয় দার্শনিক ও গণিতজ্ঞদের আবির্ভাবের পথ সুগম করেছিল।

বৈদিক যুগে ছন্দশাস্ত্রের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই বিষয়ে আমাদের মূল হাতিয়ার হলো মহামুনি পিঙ্গল রচিত ছন্দ:সূত্র— পিঙ্গলচ্ছন্দ:সূত্রম্ যা সৌভাগ্যক্রমে আজও টিকে আছে। পিঙ্গলের আগেও বেশ কয়েকজন ছন্দ শাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়, যথা— তাণ্ডী, সৈতব, মাণ্ডব্য, রতি ইত্যাদি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের কোনো

পৌরাণিক কালে সুশ্রুত-চিকিৎসা পদ্ধতি

কাজ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। পিঙ্গল তাঁর পিঙ্গলচ্ছদ: সূত্রমের অষ্টম অধ্যায় একে একে অসামান্য সব গাণিতিক প্রশ্ন তুলছেন এবং তার উত্তরে উপস্থাপনা করলেন এমন সব সূত্র যা আজকের গাণিতিক পরিভাষায় কেউ বিন্যাস সংক্রান্ত, কেউ আবার দশমিক সংখ্যা থেকে দ্বিনিধানী সংখ্যায় রূপান্তর অর্থাৎ Conversion from decimal to binary and viceversa বলতে পারে। এই রূপান্তরের কৃতিত্ব পেয়েছিলেন জার্মান গণিতজ্ঞ লাইবনিৎস, যাঁর সময়কাল (১৬৪৬-১৭১৬ খ্রি.) অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ বছর পরে। পিঙ্গলের একটি বিশেষ সূত্রে ধরা পড়েছে দ্বিপদ সহগের যোগফল (sum of binomial co-efficoents) যা কিনা আমরা সাধারণভাবে জেনেছি নিউটনের কাজে। ১৯৯৩ সালে ওলন্দাজ ভারততত্ত্ববিদ বি. ভ্যান নোটেন-এর গবেষণাপত্র 'Binary Number in Indian Antiquity' প্রকাশিত হয় Journal of Indian Phillosophy-তে (Pg. 31-50) এবং তারপর থেকেই আন্তর্জাতিক মহলে পিঙ্গলের ছন্দ:সূত্র নিয়ে নতুন করে নাড়াচাড়া শুরু হয়। পিঙ্গলের পরবর্তী সহস্রাধিক বছর সময় ধরে ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে যারা এসেছেন প্রায় সকলেই পিঙ্গলের সমবায় গণনার ধারণায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। আবার কয়েকজন ছান্দসিক এই ভাবনাগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে নানা রকম সূত্রের জন্ম দেন। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক আবিষ্কার ছিল বিরহাঙ্কর কাজে। পরবর্তী সময় হেমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন সেই একই গাণিতিক সূত্র $S_n=S_{n-1}+S_{n-2}$ বিশ্ব যাকে Fibonacci Sequence (ফিবোনাচ্চির অনুক্রম) নামে চেনে। এখনও কি এই অনুক্রমকে বিরহাঙ্ক-ফিরোনাচ্চি অনুক্রম বা হেমচন্দ্র- ফিবোনাচ্চি অনুক্রম বলে উল্লেখ করার সময় হয়নি? যদিও ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম Fields Medal প্রাপক ড. মঞ্জুল ভার্গব (*1) তাঁর বক্তৃতায় সবসময় হেমচন্দ্র—ফিরোনাচ্চি অনুক্রম বলেই উল্লেখ করেন।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত মূল ধারার গণিতজ্ঞরা গণিত ইতিহাস চর্চাকে কম গুরুত্ব দিতেন। বর্তমান সময় এই ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আন্তর্জাতিক গণিতের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা IMU (International Mathematical Union) যখন চার বছর অন্তর ICM (International Congress of Mathematicians) আয়োজন করে, সেই মহাযজ্ঞে গণিত ইতিহাস চর্চাও স্থান পেয়েছে। এখানে ভারতীয় গণিতচর্চা কত উচ্চমানের ছিল তা বোঝাতে ড. মঞ্জুল ভার্গবের 7th August 2014-র টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ তুলে ধরি 'Students in India should be taught about the great ancient India mathematicians like, Pingala, Hemachandra, Aryabhata and Bhaskara. Their stories and works inspired me and I think they would inspire students across India. Many of these works are written in Indian languages in beautiful poetry and contain important break throughs in the history of mathematics.'

ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসের বিষয় বহু প্রখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। ৮ অক্টোবর, ২০১৯-এ International Center for Theoritical Science আয়োজিত এক সভায়, তেমনি একটি বক্তব্য রাখেন ড. রড্ডাম নরসিংহ (*2)। শিরোনাম ছিল 'Great Triumphs and False Stories : A Brief History of Indic and European Sciences'। তাঁর বক্তব্যে তিনি কয়েকটি বিশেষ স্থানে আলোকপাত করেন। দীর্ঘ তথ্য আলোচনার মাধ্যমে তিনি এই উপসংহারে উপনীত হন যে ভারতীয়দের বিজ্ঞানচর্চার ধারাটা পশ্চিমের ধারা থেকে ভিন্ন। ভারতীয়রা Algorithm অর্থাৎ সমাধান পদ্ধতির উপর প্রধান গুরুত্ব দিত। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের বিজ্ঞানচর্চায় কোনো সাধারণ তত্ত্ব অর্থাৎ General Theory-র অভাব বোধ করা যায়। অনেক কিছুর ভাবনা বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক জায়গায় উঠে এসেছে

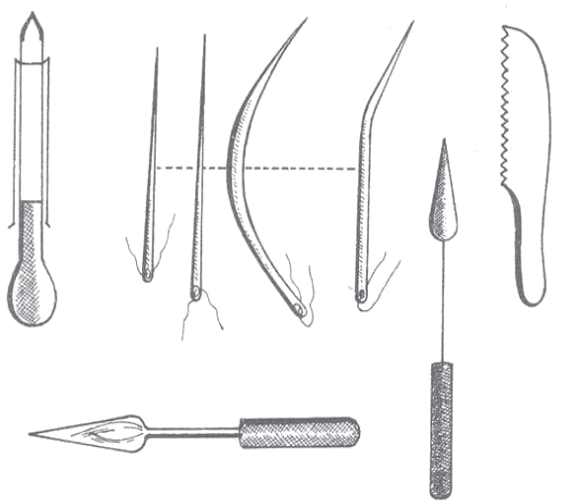

সেকালে শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত সামগ্রী।

কিন্তু ভারতীয়দের সাধারণ ভাবে তত্ত্বে বাধার নিয়মটি নিয়ে চর্চা করতে কম দেখা গেছে। যদিও এখানে ড. নরসিংহ বলেছেন যে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার সবচেয়ে মৌলিক দিকটি হলো গণনাভিত্তিক ইতিবাচকতা (Computational Positivism)। তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন ভারতীয় শল্যচিকিৎসার উৎকর্ষতাকে। বিশেষত শুশ্রুতের Nasa-Bandhanam বা Rhinoplasty-র মতো জটিল শল্যচিকিৎসা। এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। ডাঃ হেলেনাস স্কট (এমডি) রয়াল সোসাইটির সভাপতি Sir Joseph Banks-কে একটি চিঠিতে লিখছেন : 19th January 1792 : "In medicine...too delicate...to bear war and oppression... I shall not be able to praise their science very much... The effects of surgical operations are more obvious... Here I should have much to praise... [The Indians] practice [it] with great success...। অর্থাৎ এখান থেকেই খুব স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতীয় বিজ্ঞানের সামগ্রিকভাবে প্রশংসা না করলেও ভারতীয় শল্যচিকিৎসার উৎকর্ষতাকে ডাঃ স্কট অস্বীকার করতে পারেননি।

প্রাচীন ভারতে রসায়নের আবির্ভাব হয়েছিল জীবনযাত্রার প্রয়োজনেই। মূলত দুটি প্রয়োজনের তাগিদে রসায়নবিদ্যা সম্পর্কে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতেও রসায়ন সম্পর্কে আগ্রহ ও চর্চা শুরু হয়— (১) মৃৎশিল্প, কাঁচশিল্প, ধাতুশিল্প প্রযুক্তির বিকাশে, (২) চিকিৎসা প্রযুক্তি।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর কারিগররা ফেঁইয়স পাত্র গড়তে অদ্বিতীয় ছিলেন, বৈচিত্র্যময় মৃৎশিল্প গড়ে তুলেছিলেন, ধাতুশিল্পে অল্প এগিয়েছিলেন তাঁরাই ভারতের প্রাচীনতম রসায়নবিদ। আয়ুর্বেদ ও সুশ্রুতসংহিতা, চরকসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে রসায়নচর্চার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। চরকসংহিতায় ৫ ধরনের লবণের কথা বলা আছে— সৌর্বনল (শোরা), সৈন্ধব (খনিজ লবণ), বিট (কৃষ্ণলবণ), উদ্ভিদ (উদ্ভিদ লবণ), সামুদ্র (সামুদ্রিক লবণ)। মোমছাল, হরিতাল, গন্ধক প্রভৃতি খনিজের গুণ আলোচনা করা হয়েছে। ভেষজের সঙ্গে মিলিয়ে এই সব খনিজ চর্মরোগে ব্যবহার করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এটি আধুনিক বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞানের মান বিচারের সময় আমাদের সেই সময়কালটি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বস্তুবাদী দর্শন জড়জগৎ সম্পর্কে মানুষকে অনুসন্ধিৎসু ও পর্যবেক্ষক করে তোলে। সেই ধাপ পার হয়ে আসে বস্তু নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের আগ্রাহ্য সব মিলিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানকে গবেষণা, জানা বোঝার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। মানুষ প্রকৃতির অংশ, কিন্তু জীবজগতের অন্য অধিবাসীদের সঙ্গে তার পার্থক্য হলো মানুষ প্রকৃতির সচেতন অংশ এবং প্রকৃতিকে সে পর্যবেক্ষণ করে তার নির্যাসটি নিতে পারে উন্নততর জীবনের স্বার্থে। প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদী দর্শন ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে বিশেষত গণিত, জ্যোতির্বিদ্যার, চিকিৎসাপ্রযুক্তি অনেক অগ্রসর ছিল— কিন্তু সমাজের ওপর নানা রকমের প্রতিকূল পরিস্থিতি আসায় বিজ্ঞানের সাধনার ধারায় নানা রকমের আক্রমণ নেমে আসে। কিন্তু সেই ঐতিহ্যকে অসম্মান করার এক প্রবণতা তৈরি হয় ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের ভারত সম্পর্কে ইতিহাস রচনার মধ্যে দিয়ে।

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শুরু হয়েছিল প্রাচীনগ্রিক সভ্যতা থেকে এটা প্রমাণ করতে গিয়ে ভারত, চীন, আরব, মিশরের সুপ্রাচীন সভ্যতার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির কৃতিত্বগুলিকে হয় অস্বীকার করেছেন বা খাটো করার চেষ্টা করেছেন। মেকলের একটি মন্তব্য সে সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল— 'ইউরোপের কোনো গ্রন্থাগারে একটি মাত্র তাকে যা বই আছে, তা সমগ্র ভারত ও আরবের সম্মিলিত রচনার সমতুল।' এখন অবশ্য সে ধারার ইতিহাস চর্চার পরিবর্তন এসেছে পাশ্চাত্যবিদদের মধ্যে। তাই আমাদের সকলের জেনেবুঝে উচিত তথ্য প্রচার করা। বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান মনস্কতা চিরকালই সার্বজনীন— তার কোনো (biased agenda) পক্ষপাতদুষ্ট আলোচ্যসূচি থাকতে পারে না। যারা এর অন্যথা করে তাদের চিন্তা-ভাবনার সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এখানে স্বামী বিবেকানন্দর কিছু উক্তি তুলে ধরছি— ("As I look back upon the history of my country, I do not find in the whole world another country which has done quite so much for the improvement of the human mind. Therefore I have no words of condemnation for my nation. I tell them, 'You have done well; only try to do better.' Great things have been done in the past in this land and there is both time and room for greater things to be done yet... Our ancestors did great things in the past, but we have to grow into a fuller life and march beyond even their great achievement." Swami Vivekananda-Complete Works Vol III p. 195)

ভাবার্থ : যখন আমি আমার দেশের অতীতের কথা ভাবি তখন পৃথিবীর অন্য কোও দেশ আমার চোখে পড়ে না যারা মানব মননের উন্নতির জন্যে এত করেছে। তাই আমার দেশকে আমি ভর্ৎসনা করি না বরং আমি দেশবাসীকে বলি যে— তোমরা ভালো করেছ— আরও ভালোর জন্যে প্রস্তুত হও। এই ভূমি অতীতে প্রচুর কৃতিত্বের দাবি রাখে। আমাদের তাঁদের ঐতিহ্যকে বহন করতে আরও ভালো মানুষে পরিণত হতে হবে ও তাঁদের মহৎকর্মকে অতিক্রম করে অনেক বড়ো মহৎকর্মের প্রতি অগ্রসর হতে হবে।

শেষে এই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, ইতিহাসকে তথ্য ও যুক্তির ওপর বিচার করে যতদূর দেখা গেছে তাতে বোঝা যায় ভারতে গাণিতিক বিপ্লব শুরু হয় পশ্চিমের অনেক আগে। তাই এখানে একটি প্রশ্ন তুলে বর্তমানের আলোচনায় দাঁড়ি টানা যাক— (Needham Question)

"With the appearance on the scene of intensive studies of mathematics, science, technology and medicin in the great non-European Civilizations, debate is likely to sharpen, for the failure of china and India to give rise to distinctively modern science while being ahead of Europe for fourteenth previous centuries in going to take some explaining—" অর্থাৎ চোদ্দ শতক ধরে চীন ও ভারত গণিত, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ইউরোপের চেয়ে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান ইউরোপ কী করে হলো? "how Galilean science could come to birth in Pisa but not in Patna or Peiking"—অর্থাৎ গ্যালিলীও বিজ্ঞানের ধারার জন্ম পাটনা বা পেকিং না হয়ে পিসা শহরে কী করে হলো? ▫

অলিম্পিকে পিভি সিন্ধুর অসামান্য জয়

নিলয় সামান্ত

সুশীল কুমারের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে এবং প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে অলিম্পিক্সে ব্যক্তিগত ইভেন্টে জোড়া পদক এখন সিন্ধুর মুকুটে। অলিম্পিক্সে সিন্ধুর ব্রোঞ্জ জয়ের পর দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়া জগতের মানুষজন তাঁকে অভিনন্দন বার্তা দিয়েছেন। পর পর দু'বার অলিম্পিক্স পদক জিতে রেকর্ড করে ফেলেছেন পিভি সিন্ধু। টোকিয়ো অলিম্পিক্সে সিন্ধু-ঝড়ের কাছে উড়ে গিয়েছেন চীনের হি বিংজিয়াও। ২১-২৩, ২১-১৫ ব্যবধানে তাঁকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন সিন্ধু।

ভারতে মেয়েদের ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে প্রথম দুটি নাম সাইনা এবং সিন্ধু। তাঁদের মধ্যে আরও একটা বড়ো সম্পর্ক, তাঁরা একই গুরুর শিষ্য ছিলেন। পুল্লেলা গোপীচন্দ। সিন্ধু না সাইনা? ভারতে মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে সেরার লড়াইয়ে কে এগিয়ে, তা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বিতর্ক। ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সে সাইনার হাত ধরেই ব্যাডমিন্টনে প্রথম পদক আসে ভারতে। সাইনা সে বার ব্রোঞ্জ জেতেন। গত বার অর্থাৎ ২০১৬ সালের রিয়ো অলিম্পিক্সে সিন্ধু জেতেন রুপো। খালি হাতে ফেরেন সাইনা। এবার অলিম্পিক্সে সাইনা যেতেই পারেননি। আর সিন্ধু ব্রোঞ্জ জিতে ফিরলেন।

দ্রোণাচার্য কোচ এবং প্রাক্তন অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন গোপীচন্দ সিন্ধুর সাফল্যে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, 'পর পর দুটি অলিম্পিক্সে পদক জয়ের জন্য সিন্ধুকে অভিনন্দন। সিন্ধু ও তার সহযোগী কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের কারণেই এই সাফল্য এল। ভারত সরকার এবং ক্রীড়া মন্ত্রককে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।'

তবে ব্যাডমিন্টন কোর্টে হায়দরাবাদের ২৬ বছর বয়সি শাটলারের বিধ্বংসী রূপ এর আগেও দেখেছে বিশ্ব। ফিরে দেখা যাক সিন্ধুর কয়েকটি অবিশ্বাস্য কীর্তি। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে পর পর দু'বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সিন্ধু। এর পর ২০১৭ সাল থেকে টানা তিন বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পা রাখেন তিনি। ২০১৭, ২০১৮-তে রুপো জিতলেও ২০১৯ সালে ফাইনালে সোনার হাসিটি হেসেছিলেন তিনিই।

২০১৯ সাল। মাত্র ৩৮ মিনিট সিন্ধু-ঝড়ের কাছে উড়ে গেলেন জাপানের নজোমি ওকুহারা। সুইৎজারল্যান্ডের বাসেলে একেবারেই একতরফা ম্যাচে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন পিভি সিন্ধু। ভারত থেকে সেই প্রথম। সেদিন বাসেলে সোনার পদক ছিনিয়ে নেওয়ার পর কিংবদন্তি শাটলার চীনের ঝ্যাং নিয়ের এক অনন্য রেকর্ড স্পর্শ করলেন পিভি সিন্ধু। নিংয়ের মতোই বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ থেকে পাঁচ-পঁচটি পদক হয়েছিল তাঁর।

অনন্য রেকর্ড আরও রয়েছে সিন্ধুর ঝুলিতে। ২০১৬-তে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে অলিম্পিক্সে রুপোর পদক পান তিনি। সে বছর ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে স্পেনের ক্যারোলিনা মারিনের কাছে সেই হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে হেরে গেলেও সিন্ধুর লড়াই মনে রেখেছেন সবাই।

এশিয়ান গেমস থেকেও রুপোর পদক তুলে নিয়েছেন পিভি সিন্ধু। ২০১৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় চীনের তাই জু ইংকে হারিয়েছিলেন সিন্ধু। এশীয় স্তরে সাফল্যের আগেও কমনওয়েলথ গেমসে কৃতিত্বের ছাপ রেখেছিলেন পুল্লেলা গোপীচন্দের এই ছাত্রী। ২০১৪-তে গ্লাসগোতে মালয়েশীয় শাটলার টি জিং ই-কে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জয়। এরপর ২০১৮-তে ফের কমনওয়েলথে সাফল্য আসে। সেবার অস্ট্রেলিয়ায় ট্যুরের মতো কঠিন প্রতিযোগিতাতেও সাফল্যের মুখ দেখেছেন সিন্ধু। মোট ছ'টি লেভেলে ভাগ করা থাকে এই ট্যুর। ২০১৮-তে সেই ট্যুরের অঙ্গ হিসেবে ইন্ডিয়ান ওপেন, তাইল্যান্ড ওপেনে রানার্স-আপ হন সিন্ধু। বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালস জয়ের পর এবছরে ইন্দোনেশিয়া ওপেনের ফাইনালেও ওঠেন তিনি।

বিডব্লিউএফ সুপার সিরিজেও জয়জয়কার সিন্ধুর। বিশ্বের বাছাই করা শাটলারদের মাঝে সেখানেও নিজস্ব গতি বজায় রেখেছিলেন তিনি। ২০১৫-তে ডেনমার্ক ওপেনে রানার্স-আপ, '১৬-তে চীন ওপেন জেতার পর হংকং ওপেনে রানার্স-আপ। এর পরের বছর ইন্ডিয়ান ওপেন ও কোরিয়া ওপেন জয়। সে বছরই হংকং ওপেন এবং বিডব্লিউএফ সুপার সিরিজ ফাইনালে রানার্স-আপ। বিডব্লিউএফ গ্রাঁপ্রি-তেও ছ'বার জিতেছেন সিন্ধু। ২০১৩-তে মালয়েশীয় মাস্টার্স ও ম্যাকাও ওপেন জেতেন তিনি। এর পরের দু'বছরও টানা দু'বার ম্যাকাও ওপেন বিজয়ী। '১৬-তে ফের মালয়েশীয় মাস্টার্স এবং '১৭-তে সৈয়দ মোদী আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট জয়।

কুম্ভমেলার কাহিনি

ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই 'কুম্ভ' মেলার নাম শুনেছো। ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট চারটি স্থানে চার বছর অন্তর 'কুম্ভ' মেলা হয়। নির্দিষ্ট স্থানে ঠিক ১২ বছর পরপর এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই মেলার সঙ্গে আমাদের ভারতীয় সনাতনি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে।

হিন্দু ধর্মের এক অন্যতম কাঙ্ক্ষিত ও জনপ্রিয় মেলা তথা একত্রিত হওয়ায় এক উৎসব এই কুম্ভ মেলা। লক্ষ লক্ষ মানুষের মিলনমেলা বলা যেতে পারে। হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিক এই চারটি স্থান কুম্ভ মেলার জন্য নির্দিষ্ট। তোমরা হয়তো টিভিতে বা ইন্টারনেটে ইউটিউব চ্যানেলে দেখে থাকবে এই কুম্ভ মেলায় নাগা সন্ন্যাসী তথা হিন্দু ধর্মীয় সমস্ত রকমের সন্ন্যাসীরাই উপস্থিত থাকেন।

কিন্তু বন্ধুরা ভেবে দেখেছো যে কুম্ভ মেলা কেন সবসময় এই চারটি স্থানেই হয় ও কেন সাধু-সন্ন্যাসীদের পরম মিলনস্থল এই 'কুম্ভ' মেলা। বলা হয়, নিজে স্বয়ং যে কুম্ভ মেলায় গেছে, সেই একমাত্র এই মেলার মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। দূর থেকে দেখে এই মেলার অন্তরাত্মাকে অনুধাবন করা যায় না। তবে এসো বন্ধুরা, আজ আমরা জেনে নিই পৌরাণিক সাহিত্যে কুম্ভের উৎপত্তির কাহিনি।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিতে সমুদ্র মন্থন এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, তবে এর আগে রয়েছে এক অভিশাপের কাহিনি। মহর্ষি দুর্বসা মুনি অভিশাপ দিয়েছিলেন স্বর্গের দেবতাদের। সেই অভিশাপে দেবতারা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েন। স্বয়ং ইন্দ্রদেবেরও শক্তির ক্ষয় হয় দুর্বাসা মুনির অভিশাপে।

আর এমন সুযোগ একেবারেই হাতছাড়া না করে দানবেরা স্বর্গ আক্রমণ করে ও দেবতাদের পরাস্ত করে স্বর্গের অধিকার নিয়ে নেয়। পরাস্ত, ভীত ও হতমান দেবতারা অতপর ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের দুর্দশার বিষয়ে অবগতই ছিলেন। অগত্যা দেবতাদের তিনি একটি পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, সপ্ত সাগর মন্থন করলে এক অমৃতকুম্ভ তথা কলস প্রাপ্ত হবেন দেবতারা। ওই অমৃত যে বা যারা পান করবেন তারা হয়ে উঠবেন অপরাজেয়।

দুর্বাসা মুনির শাপে হীনবল দেবতাদের সাধ্য ছিল না নিজেদের শক্তিতে সমুদ্র মন্থন করেন, তাই তারা ছলনার আশ্রয় নিয়ে দানবদের মৈত্রীর প্রস্তাব পাঠালেন। সমুদ্র মন্থনের প্রস্তাব শুনে দানবেরা দেবতাদের সঙ্গে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে তুমুল পরিশ্রম শুরু করলেন। অতপর সমুদ্র মন্থনের পর উঠে এলো অমৃত-কুম্ভ। কিন্তু দেবতারা আগেই শঠতার আশ্রয় নিয়ে দানবদের এই কর্মে যুক্ত করেছিলেন এবং ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত দেবতাদের দেবতাদের ইশারায় অমৃত-কুম্ভ নিয়ে পলায়ন করলেন। দেবতারা অমৃতের মাহাত্ম্য জানেন, এর সামান্য এক ফোঁটাও পেলে দানবেরা তাদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কানে গেল জয়ন্তের অমৃতকলস নিয়ে পলায়নের কথা। ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য দৈত্য ও দানবদের আদেশ করলেন জয়ন্তকে ধরে আনতে। জয়ন্তকে মাঝপথে দৈত্য ও দানবেরা ধরেও ফেলেছিলেন। কিন্তু এবার দেবতাদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ শুরু হলো। সে কাহিনি পরে বলবো। শুধু বলে রাখা ভালো, ওই যুদ্ধকালীন চার ফোঁটা অমৃত গড়িয়ে ভূমিতে পড়ে। যে চার স্থানে অমৃত পড়েছিল বলে পুরাণ কথামালায় বর্ণিত আছে, সেই চার স্থানেই হয় কুম্ভ মেলা। প্রথম ফোঁটা পড়েছিল প্রয়াগে, দ্বিতীয় ফোঁটা পড়ে হরিদ্বারে। তৃতীয় ফোঁটা উজ্জয়িনীতে ও চতুর্থ ফোঁটা পড়েছিল নাসিকে। এই যে অমৃত ফোঁটা পড়েছিল তা থেকে সৃষ্টি হয় চারটি পবিত্র নদী। হরিদ্বারে গঙ্গা, নাসিকে গোদাবরী, প্রয়াগ তথা এলাহাবাদে তিন নদীর সঙ্গমস্থল--- গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদী।

প্রতিটি নদীর জলে স্নানের পর শরীরে এক পুণ্য সঞ্চয় হয়। কুম্ভ মেলা তাই এক পবিত্র স্নানের উৎসব। দুর-দূরান্ত থেকে গৃহী, সাধু-সন্ন্যাসী, নাগা সন্ন্যাসীরা তাই পুণ্যস্নানে আসেন এই কুম্ভলোয়।

অনামিকা দে

ভারতের বিপ্লবী

উধম সিংহ

উধম সিংহ ছিলেন ভারতমায়ের এক বীর সন্তান। ১৮৯৯ সালে ২৬ ডিসেম্বর উধম সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময়ে যিনি পঞ্জাব প্রদেশের গভর্নর ছিলেন, সেই মাইকেল ও ডায়ার-কে হত্যা করার জন্য তিনি সংকল্পবদ্ধ হন। এই উদ্দেশ্যে উধম সিংহ ১৯৩৪ সালে বিলেত গমন করেন। অবশেষে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে জালিওয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ২১ বছর পরে লন্ডনের এক সভাকক্ষে তিনি মাইকেল ও ডায়ারকে গুলি করে হত্যা করেন। এই অপরাধে ১৯৪০ সালে ৩১ জুলাই মাত্র ৪০ বছর বয়সে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর এই বলিদান প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জানো কি?

বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক

- ভারত—অশোকচক্র।
- বাংলাদেশ—শাপলা।
- সিরিয়া—ঈগল।
- ব্রিটেন—গোলাপ
- ইতালি—শ্বেতপদ্ম।
- অস্ট্রেলিয়া—ক্যাঙ্গারু।
- ফ্রান্স—লিলি।
- ত্রিনিদাদ—হামিংবার্ড।
- জাপান—চন্দ্রমল্লিকা।
- নেদারল্যান্ড—সিংহ।

ভালো কথা

আমার দিদা

ছোটোবেলা থেকে আমার দিদা অর্থাৎ আমার মায়ের মা আমাকে আদর, যত্নে ও স্নেহে মানুষ করেন। সকাল ৯ টার পর বাবা-মা চলে যান ইস্কুলে পড়াতে। আর আমি সারাদিন থাকি আমার দিদার কাছে। দিদা আমাকে খুব ভালোবাসেন। আমিও দিদাকে খুব ভালোবাসি। দিদা আমাকে স্নান করিয়ে ভাত খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন। ঘুমোনোর আগে দিদা আমাকে নানা গল্প বলেন ও নানা ছড়া শেখান। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে আমি যেন প্রত্যেক জন্মে এরকম দিদা পাই।

উদিত দত্ত, চতুর্থ শ্রেণী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) প্র সা মা শ্যা	(১) দ্ধি জী বু বী
(২) ন্দ্র ধা বি চ	(২) শ্ব দ্যা বি ল বি য়

২ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) জঙ্গলমহল (২) চৈতন্যমঙ্গল

২ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) হৃদয় বিদারক (২) স্বাধিকার চেতনা

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা। (২) শ্রেয়া পাল, বেগুনকোদর, পুরুলিয়া। (৩) আশিস গোপ, খাতড়া, বাঁকুড়া। (৪) রাণা সিংহ, পান্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

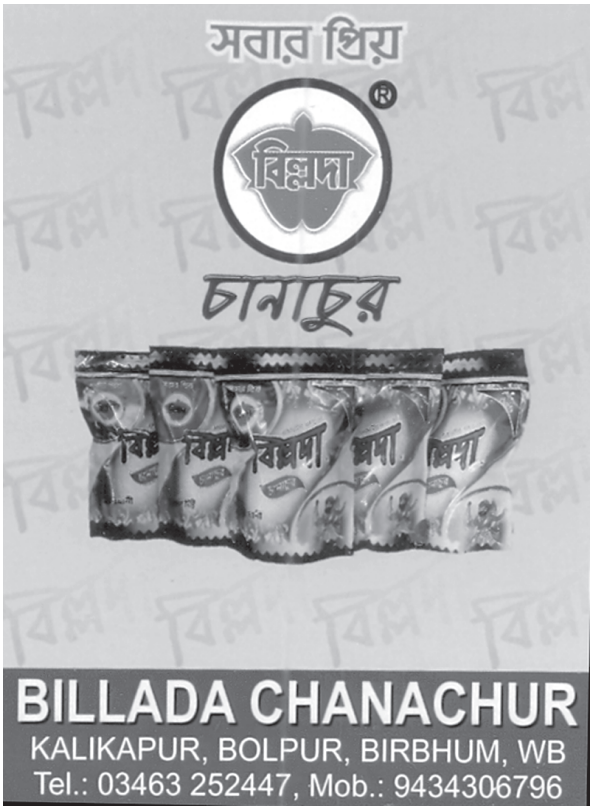

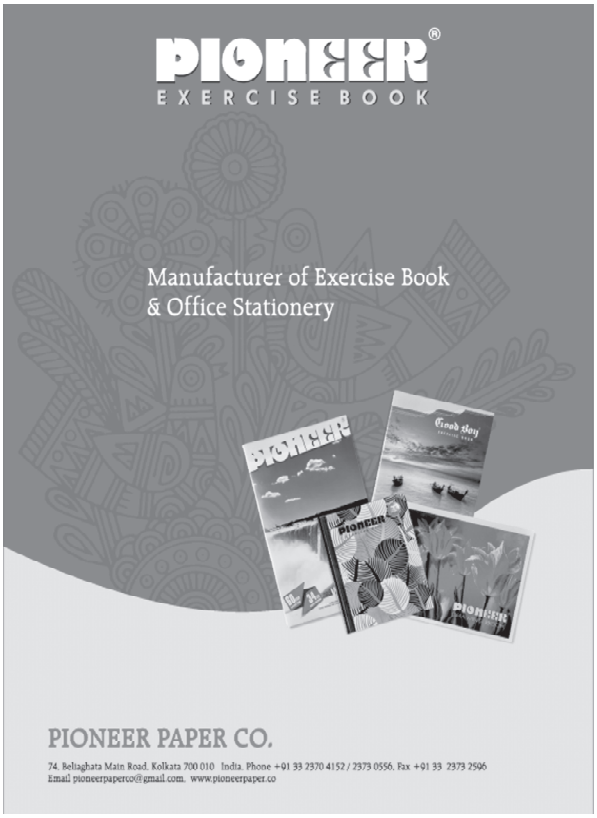

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

হিরোসিমায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কারণ আজও রহস্যাবৃত

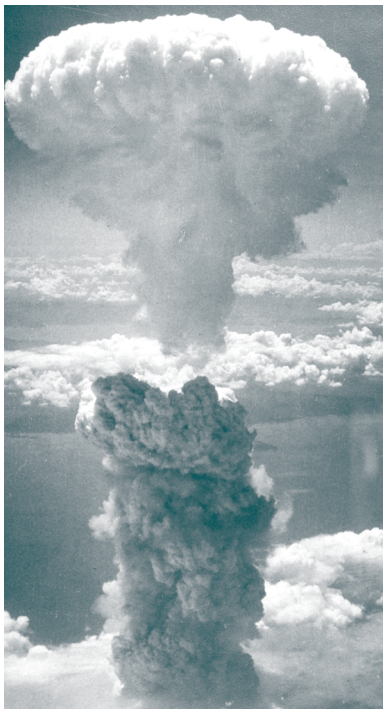

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার মুদ্রা, অর্থ দপ্তর, পতাকা, মন্ত্রীসভা সব তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি নেতাজীকে নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে, অনেক বই লেখা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে সেই সরকার তৈরি হল, কীভাবে সেনাবাহিনী তৈরি হলো? তামিলনাড়ুর অনেক মানুষ শ্রমিক, কুলি মজুর হয়ে মালয়শিয়া গিয়েছিলেন। তাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রজন্ম জানতই না ভারত দেশটা কীরকম, তারা কোনোদিন ভারতে আসেইনি। তাদের মধ্যে ছিল গরিব লোকরা তারা দলে দলে যোগ দিয়েছিল সেই বাহিনীতে। একজন গরিব মহিলা তাঁর গোরু নিয়ে এসেছিলেন সেনাবাহিনির ছেলেরা দুধ খাবে বলে।

গবেষকরা যে দাবি করেন যে ২১ অক্টোবরকে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হোক, সেই দাবি কোনো ভ্রম থেকে নয়। প্রথম কথা, ১৮ জুলাই সমস্ত কাগজপত্র, সইসাবুদ, দলিল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। র‍্যাডক্লিফকে ডেকে আনা হয়েছিল, তিনি একজন ব্যারিস্টার। অথচ ২৮ দিন পরে কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করা হল? ১৮ জুলাইয়ের পরেই নয় কেন? মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে অনুরোধ করেছিলেন ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করতে। নেহরু তা মেনে নিয়েছিলেন। ওইদিন ঘোষণা করার কারণ ওইদিনে জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সরকারিভাবে সমাপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতীয়রা যেন মনে রাখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে, জাপান আত্মসমর্পণ করেছে, তার মানে নেতাজী জয়ী হতে পারেননি। আর একটা প্রশ্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সবাই বুঝেছিল যে ব্রিটিশদের চলে যেতে হবে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকভাবে যেতে হবে। আইএনএর কাছে হেরে চলে যাওয়া এবং স্বেচ্ছায় চলে যাওয়ার মধ্যে তফাতটা কী? মানহানি হতে পারত। কারণ ব্রিটিশদের লোকক্ষয় তো হচ্ছিল না লড়াই হচ্ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের। ব্রিটিশদের কোনো লোকক্ষয় হচ্ছিল না। তবুও তাদের মধ্যে একটা তাড়া দেখেছি। ব্যারিস্টার হয়েও র‍্যাডক্লিফ পাঞ্জাব ও বাংলা যেখানে ভারত ভাগ হবে সেখানে গেলেন না, দিল্লিতে বসে রইলেন, এমন একটা ভাব যেন '৪৬, '৪৭-ওর মধ্যে চলে যেতে হবে। তৃতীয় প্রশ্নঃ আজ পর্যন্ত আমেরিকা যার সদুত্তর দিতে পারেনি। তারা জাপানে কেন অ্যাটম বোমা ফেলেছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আমেরিকা রাশিয়া দুদিক থেকে জার্মানিকে শাঁড়াসি আক্রমণ করেছিল। সুতরাং কোনো দরকার ছিল না।

আমেরিকা প্রথমে বলেছিল হিরোসিমায় বোমাবর্ষণ পার্ল হার্বারে জাপানের বোমা ফেলার প্রতিশোধ। কিন্তু জাপান পার্ল হার্বারে বোমা ফেলেছিল ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর— তার চার বছর বাদে এত বড় প্রতিশোধ! জাপান কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজ নষ্ট করেছিল পার্ল হার্বারে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান বলেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য এটা করা হয়েছিল যাতে বহু মানুষের বাস করা দুটো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে বোমা ফেলে বেশি লোক মারা যায়। দুটো শহরই ছিল পাহাড় দিয়ে ঘেরা যাতে রিভারবিরেশনের ফলে

> কাটিস বলেছিলেন বোমা ফেলার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার কোন সম্পর্ক ছিল না। জাপানে অ্যাটম বোম ফেলা হয়েছে বোসকে আটকানোর জন্য। তিনি রাশিয়া গিয়ে আবার সেনাবাহিনী তৈরি করে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন। তাকে আটকানোর দরকার ছিল খ্রিস্টান দুনিয়ার, আমেরিকার, ব্রিটেন আদি ইউরোপের।

ফঃ ৬

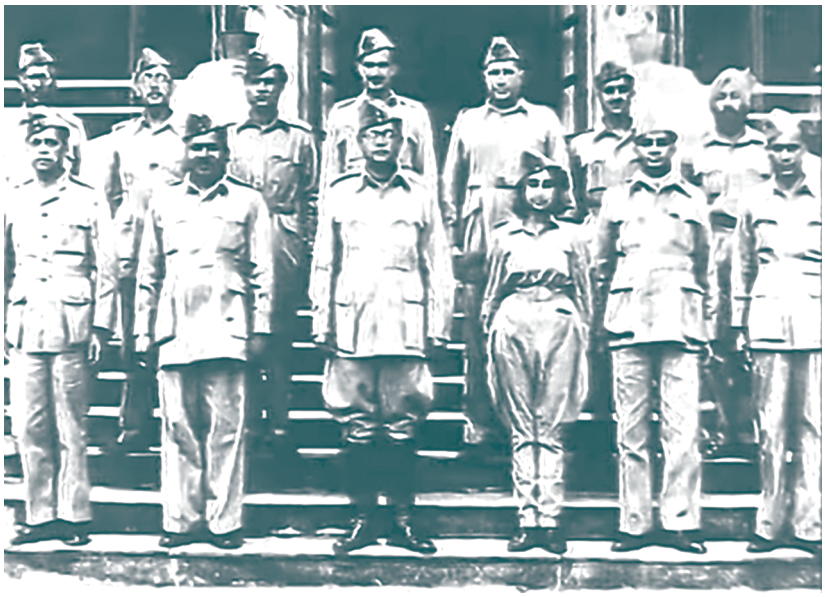

সর্বাধিক মানুষ মারা যায়।

জার্মানি ইহুদিদের কাছে বারবার ক্ষমা চায় তাদের উপর অত্যাচারের জন্য, বহু টাকা উপঢৌকন দেয়। কিন্তু আমেরিকার পরবর্তী কোনো রাষ্ট্রপতি আজ পর্যন্ত ক্ষমা তো চাননি জাপানের কাছে, এমনকী কোনো সমর্থনও দেননি। মনে রাখতে হবে ইহুদিরা আব্রাহামিক, খ্রিস্টান ও ইসলামিদের মতো। সুতরাং সেখানে একটা চাপ আছে ইহুদিদের তরফে অন্য দুই আব্রাহামিক ধর্মের উপর। আর জাপান বৌদ্ধ দেশ, অর্থাৎ ইন্ডিক ধর্ম। সেখানে ভ্যাটিক্যান, মক্কা বা জেরুজালেম থেকে কোনো প্রতিবাদ হবে না। আর বাংলায় তার চার গুণ লোক মারা গিয়েছিল চার্চিলের তৈরী করা দুর্ভিক্ষে। কোনোরকম ক্ষমা চায়নি ব্রিটিশরা আজ পর্যন্ত। আজ পর্যন্ত কোনো ভারত সরকার সরকারিভাবে ক্ষমা চাইতে ব্রিটেনকে বলেওনি।

যদি আইএনএ সফল হত, দিল্লি পৌঁছে যেত, নেতাজী যদি সর্বাধিনায়ক হতেন, নেহরু গান্ধীর জায়গাটা যদি না থাকত, তাহলে প্রথম জিনিস যেটা হত তাহ'ল সেই ভারত অবিভক্ত ভারত হিসাবে স্বাধীন হতো। প্রকৃতপক্ষে যখন আইএনএ ঢুকছে, কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, অনেক ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির সৈন্য আইএনএতে ফেন্স জাম্পিং করেছে তখন কলকাতাতেই কিছু সিনিয়র মুসলিম লীগ নেতাকে স্বগতোক্তির মত বলতে শোনা গেছে আইএনএ যদি এসে যায় তাহলে আমাদের স্বাধীন পাকিস্তানের কী হবে? সেই স্বপ্নটার কী হবে?

যদি নেহরু গান্ধী কংগ্রেসের বাইরে একজন প্রকৃত ভারতীয় ক্ষমতায় আসত (নেহরু বলেছিলেন আমিই শেষ শ্বেতাঙ্গ ভরত শাসন করার জন্য) তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশাসন, ইতিহাসচর্চা, রাজনীতি, গ্রামোন্নয়ন, নগরোন্নয়ন পুরো পরিকাঠামোটাই অন্যরকম হত; আমাদের ইউরোপীয়দের নকল করার দরকারই হত না। সবচেয়ে বড় কথা আমরা জানতাম আমরা কী। আমরা জানতে পারতাম যে আমরাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা। এটার জন্য গল্প করার দরকার হত না। সমস্ত পৃথিবী তাকিয়ে দেখত আমাদের দিকে পৃথিবীর নেতা হিসাবে। উদাহরণ হিসাবে কে কবে নোবেল পুরস্কার দেবে সেই দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হত না। আমরা নিজেদের পুরস্কার চালু করতাম যেমন সাহিত্যের জন্য বাল্মিকি বা কালিদাস সম্মান, রাজনীতির কৌশলের জন্য চাণক্য পুরস্কার, বিজ্ঞানের জন্য আর্যভট্ট পুরস্কার। তার জন্য সবাই আমাদের দিকে লালায়িত হয়ে তাকিয়ে থাকত। ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় নাচগান, সারা পৃথিবীতে নজর কাড়ত।

আজ যেমন আমরা আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি তেমনি ইউরোপীয়রা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য উৎসুক হত, যেটা হয়েছিল বুদ্ধের সময়ে নানা দেশ থেকে ছাত্ররা ভারতের নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াটাকে খুব সম্মানের বলে মনে করত। তাদের ইন্দোনেশিয়ার কোনো বিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত শিখে ভারতে ঢুকতে হতো তবে তারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করতে পারত। এইটা আটকানোর কি খুব দরকার ছিল? হ্যাঁ অবশ্যই ছিল। তার জন্য মানুষ যখন তর্ক তোলে অ্যাটম বোমা তো আমেরিকা ফেলেছিল তার সঙ্গে ব্রিটিশদের কী সম্পর্ক তখন বলতে হয় আমেরিকা কারা তৈরি করেছিল? শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় ব্রিটিশরা। কানাডা তৈরি করেছিল ব্রিটিশ ও ফরাসিরা। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়রা। ইটালি বা জার্মান ততটা নয়। আমেরিকার সংস্কৃতি তো ইঙ্গ-ইউরোপীয় সংস্কৃতি। পুরো পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি যুক্ত।

গত তিন চার বছরে নেতাজী নিয়ে একটা তর্ক, আলোচনা, উত্তেজনা চলছে। আগে এসব কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষক আলোচনা করতেন। এখন সেটা গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। নেতাজীকে নিয়ে অনেক দল তৈরি হয়েছে, তাদের মধ্যে মতভেদ আছে ভীষণরকম কিন্তু তাকে অপ্রাসঙ্গিক করা যায়নি। সেই নেতাজীকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য কম চেষ্টা হয়নি। তাকে ঘিরে একটা মিথ্যার ঘন জঙ্গল তৈরি করা হয়েছিল। তার মধ্যে আছেন গান্ধী, নেহরুর কংগ্রেস, আমাদের সমস্ত স্কলার, গবেষক, লেখক, বামেরা, তথাকথিত কিছু নষ্ট পচা বুদ্ধিজীবি। সত্যের ধারাকে আটকানোর জন্য মেকী সত্য নির্মাণ করা হয়েছে। ওদের মোটিভটা বোঝা দরকার।

ডগলাস ম্যাকার্থার কম্যান্ডার অব ইউএস আর্মড ফোর্সেস বলেছিলেন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় কারণে জাপান আত্মসমর্পণের মুখে। আর একজন কাটিস নিজে বলেছিলেন বোমা ফেলার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার কোন সম্পর্ক ছিল না। জাপানে অ্যাটম বোম ফেলা হয়েছে বোসকে আটকানোর জন্য। তিনি রাশিয়া গিয়ে আবার সেনাবাহিনী তৈরি করে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন। তাকে আটকানোর দরকার ছিল খ্রিস্টান দুনিয়ার, আমেরিকার, ব্রিটেন আদি ইউরোপের। ▮

চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা আর কসাই-এর সাক্ষী সন্ত্রাসবাদী

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি খবরে জানা গেছে অসমের কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রিপুণ বরা কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠিতে লিখেছেন, 'নিশীথ প্রামাণিক আদতে বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ির হরিনাথপুরের বাসিন্দা। কম্পিউটার কোর্স করার নামে ভারতে আসার পরে কোচবিহারে থেকে যান। প্রথমে তৃণমূলে এবং পরে বিজেপিতে যোগ দিয়ে সাংসদ হন।'

রিপুণ বরা তাঁর চিঠিতে আরও লিখেছেন, নিশীথ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে তাঁর আদিবাড়িতে থাকা বড়োভাই এবং গ্রামবাসীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। 'এ বিষয়টি নিয়ে যে সংশয় তৈরি হয়েছে, তার জন্য একটি স্বচ্ছ তদন্তের বন্দোবস্ত করে নিশীথ প্রামাণিকের জন্মস্থান ও নাগরিকত্বের বিষয়টি পরিষ্কার করা হোক।'

প্রধানমন্ত্রীকে লেখা রিপুণ বরার এই চিঠির প্রেক্ষিতে তাঁকে কয়েকটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাই যে ঘটনাগুলো দেশভাগের আগে, দেশভাগের সময় এবং পরে ঘটিয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের মাতব্বরেরা।

১। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করেছে কে?

২। দেশভাগের সময় বিজেপি নামে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। যদি দেশভাগ না হতো তাহলে নিশীথ প্রামাণিককে কম্পিউটার কোর্স করার জন্য কোচবিহারে আসতে হলেও তাঁর নাগরিকত্বের প্রশ্ন আসত না। দেশভাগের জন্য তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর যেভাবে নারকীয় অত্যাচার চালিয়ে হিন্দুদের দেশছাড়া করা হয়েছিল সেকথা কি ভুলে গেছেন?

৩। কংগ্রেসের করা দেশভাগ নামক পাপের ফলে দেশের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে একের পর এক রাজ্যে কংগ্রেস বিলুপ্ত হয়ে

নিশীথ প্রামাণিক

হাসান ইমরান

যাচ্ছে সেই বেদনা ঢাকার জন্যই কি রিপুণ বরার এই নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা?

৪। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করা হলো অথচ ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় করা হলো না কেন? লোক বিনিময় হলে এই নাগরিকত্বের প্রশ্ন আসত না। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী যাদের কারও নামে সন্ত্রাসের অভিযোগ আছে তারা কংগ্রেস -সহ অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিরাজ করছে তাদের দিকে আঙুল না তুলে নিশীথের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছেন কেন?

৫। রিপুণ বরা অসমবাসী হয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছেন কেন?

৬। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা সঙ্গে রোহিঙ্গাদের নিয়ে অসমের বিভিন্ন নদীচর, অন্যান্য সরকারি সম্পত্তি দখল করে মায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল কাজিরাঙ্গা দখল করে সেভাবে অসমের ডেমোগ্রাফি বদলে দিচ্ছে সে বিষয়ে রিপুণবাবু চুপ করে আছেন কেন? অসমে তো বিজেপি সরকার চলছে। অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন না কেন বা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখছেন না কেন?

ভারতীয় সংসদের ওয়েবসাইটে রয়েছে, ১৭ জানুয়ারি ১৯৮৬ সালে কোচবিহারের দিনহাটা শহরে নিশীথ প্রামাণিকের জন্ম হয়। উপরন্তু বাংলাদেশে নিশীথের শরিক পরিবারের সদস্যরা সাফ জানিয়েছেন— 'দেশভাগের'র আগেই নিশিথের পূর্বপুরুষ কোচবিহারের দিনহাটায় চলে যায়।' এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে নিশীথ প্রামাণিক পলাশবাড়ি উপজেলার

হরিনাথপুর ইউনিয়নের ভেলাকোপা গ্রামের বাসিন্দা বিধুভূষণ প্রামাণিকের ছেলে। চেটাগুড়ি গ্রামের বাসিন্দা তাঁরা। বিধুভূষণ দেশভাগের আগে কোচবিহারে পাড়ি দেন। সেখানেই বিয়ে করেন। পরে ১৯৮৬-তে কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার ভেটাগুড়ি গ্রামে জন্মছেন নিশীথ।' নিশীথ প্রামাণিকের জ্যাঠা দক্ষিণারঞ্জন সাফ বলেছেন, 'নিশীথের বাবার নাম বিধুভূষণ প্রামাণিক। দেশভাগের আগে কোচবিহারে পাড়ি জমান। সেখানে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বিধুভূষণের একমাত্র সন্তান নিশীথ...।'

এদিকে সাংসদ রিপুণ বরার চিঠির প্রসঙ্গ তুলে ধরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যবসু বলেছেন— 'রাজ্যসভার সাংসদ রিপুণ বরা সঠিক প্রশ্ন তুলেছেন। বহু সংবাদমাধ্যমে নিশীথ প্রামাণিক বাংলাদেশের নাগরিক বলে উল্লেখ করেছে। এই ধরনের লোককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করার আগে কি কোনও কিছুই খতিয়ে দেখা হয়নি? ভুলে গেলে চলবে না, এই নিশিথের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অপরাধমূলক মামলা চলছে। লজ্জাজনক।'

রাজ্যের আর এক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনও বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন— 'নিশীথ প্রামাণিক বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারেন, একথা শুনেই আমি হতবাক। যদি সত্যিই কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদেশি নাগরিক হন, তবে তা ভারতের সুরক্ষার জন্য উদ্বেগমূলক বিষয়।

রিপুণ বরার চিঠির সংবাদে এরাজ্যের মহামহিম শিক্ষামন্ত্রী এবং আর এক মন্ত্রীর মন্তব্যের পর রাজ্যের আমজনতার মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করেছেন এই বলে যে— 'এতো দেখছি চোরের মায়ের বড়ো গলা বা চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা বা কসাইয়ের সাক্ষী সন্ত্রাসবাদী নামক প্রবাদবাক্যগুলো।'

এই রিপুণ বরা অসমের লোক হয়ে এখন পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু কয়েক বছর আগে এরাজ্য থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এক সন্ত্রাসবাদীকে রাজ্যসভার সাংসদ করে সংসদে পাঠিয়েছিলেন তখন কিন্তু রিপুণ বরা কোনো প্রশ্ন তোলেননি। আবার তৃণমূলের যে দু'জন মন্ত্রী এখন নিশীথকে নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন তখন তাঁরা কোথায় ছিলেন?

এবারে দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গের সেই রাজ্যসভার সাংসদ আসলে কে ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পরে তোষণকে হাতিয়ার করে কলকাতা থেকে যাকে রাজ্যসভার সাংসদ করে পাঠিয়েছিলেন তাঁর নাম 'হাসান ইমরন'। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি ভারতে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন 'সিমি'র প্রতিষ্ঠাতা। যে 'সিমি' এখনও ভারতে নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়। এই হাসান ইমরান বাংলাদেশি নাগরিক। বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গলাধাক্কা খাওয়ার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসে সন্ত্রাসের মক্কা এই রাজ্যে মাননীয়ার স্নেহাঞ্চলে রয়েছেন। শেখ হাসিনা তাঁর দেশে কড়া নির্দেশ জারি করেছেন— 'হাসান ইমরান যেন বাংলাদেশে ঢুকতে না পারে। এবং ঢুকলেই যেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।' এহেন একজন নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাকে যিনি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে পরিচিত তাঁকে যারা সংসদের সদস্য করে পাঠায় তার চেয়ে বড়ো বিপদজনক আর কী হতে পারে? অথচ এরাই ভারতে জন্ম হওয়া বিরোধী দলের মন্ত্রীর নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আর তখন বলতেই হয় রাজ্যের আমজনতার মন্তব্য সঠিক।

আমজনতা আরও বলেছেন, দুধেল গোরুরা এদেশের ধর্মনিরপেক্ষদের কারও বোনাই, কাও ফুফা, কারও নাতজামাই, কারওবা জামাই হয়। তাই তারা এত মধুর সম্পর্কের অধিকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শরমে বোবা হয়ে যায়। এবারের ভোটে জেতার পর যে দল রাজনীতির নামে দুধেল গোরু নামক নতুন আমদানি রোহিঙ্গাদের দিয়ে বিজেপির নামে শুধুমাত্র হিন্দুদের ওপর যেভাবে নারকীয় অত্যাচার শুরু করেছে এবং সেই অত্যাচারের প্রতিবাদে সমগ্র দেশ এবং বিদেশে যেভাবে এর প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে সেদিক থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্যই এদের নিশীথ বিরোধী মন্তব্য।

কথায় আছে, 'যার এক কান কাটা সে যায় গ্রামের বাহির দিয়ে। আর যার দু'কান কাটা সে যায় গ্রামের ভেতর দিয়ে।' অর্থাৎ নির্লজ্জ। সেই মতো দুই দলের দু'কান কাটা নেতার নিশীথকে নিয়ে পড়েছেন।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

খেতাবের চন্দ্রিল খ্যাতিতে চন্দ্রশেখর

ডাঃ আর এন দাস

আজাদ কোনও বংশগত পদবি ছিল না। হল স্বাধীনতা করার অপরাধে আদালতে গিয়ে!

মধ্যপ্রদেশে আলিরাজপুর শহরের অন্তর্গত ভাবরা গ্রামে পিতা সীতারাম তিওয়ারী আর মাতা জাগরণী দেবীর কোল আলো করে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ২৩শে জুলাই, ১৯০৮ সালে ভারতমাতার এই বীরসন্তানের জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষরা অবশ্য উত্তরপ্রদেশের উনাও গ্রামে থাকতেন। প্রথম সন্তান শুকদেবের জন্মের পর তাঁরা মধ্যপ্রদেশে চলে আসেন।

এইখানেই চন্দ্রশেখর অদিবাসী ভীল বালকদের সাহচর্যে তির চালানো, কুস্তি ও সাঁতার শেখেন। ছোটবেলা থেকেই অদম্য সাহসী ও শক্তিশালী হওয়ার জন্য মধ্যমপাণ্ডবের নামে আদর করে সবাই তাঁকে 'ভীম' বলে ডাকতো।

বাঘা যতীন ওরফে বাংলার যশস্বী স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, ১৯০৬ সালে কোয়া গ্রামে খালি হাতে এক রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে নেপালী কুকরি দিয়ে মেরে 'বাঘা' নামে বিখ্যাত হন। রক্তাক্ত যতীনকে নিজে রোজ সার্জিক্যাল ড্রেসিং করতেন আর এক বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী। ব্রিটিশ সরকার তাঁর অসীম সাহস ও শক্তি দেখে রৌপ্যপদক এবং 'বাঘা' পদবিটি প্রদান করে।

যাইহোক, চন্দ্রশেখর ছিলেন তিওয়ারী হলেন আজাদ। আদালতে নৃশংস এক ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট 'রেভারেণ্ড' টমসন ক্রেগার্ট মাত্র ১৫ বছর বয়সের স্বাধীনতাকামী প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন বালকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এইভাবে। প্রশ্নঃ নাম? উত্তর ঃ চন্দ্রশেখর আজাদ। প্রশ্নঃ বাবার নাম? উত্তরঃ সীতারাম স্বতন্ত্রতা আর শেষ প্রশ্নঃ ঠিকানা? উত্তর ঃ জেল। নৃশংস সাদা চামড়ার রেভারেণ্ড শাস্তি দিলেন ২৩ সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ড আর প্রতিদিন গুণেগুণে ১৫টি বেত্রাঘাত।

চন্দ্রশেখর আজাদের উপর লেখা নন্দকিশোর নিগমের বিখ্যাত পুস্তক, 'এন ইম্মরটাল রেভলিউশনারি অব ইন্ডিয়া' থেকে জানতে পারা যায় বিপ্লবী জীবনের অজানা অনেক তথ্য। লেখক নিজেও ছিলেন চন্দ্রশেখরের একজন সুযোগ্য সহযোগী বিপ্লবী।

জনমানসে জাতীয় কংগ্রেস সেসময় ব্রিটিশের তাঁবেদারে পরিণত হয়েছিল। তাই যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংস পথে সর্বান্তকরণে ব্রিটিশ বিতাড়নের বিরাট প্রস্তুতি চলছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন স্বাধীনতা ভিক্ষার মাধ্যমে আসবে না। অত্যাচারী ইংরেজকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেই তারা ভারত ছাড়বে!

বাল্যকালে চন্দ্রশেখর খুবই দুরন্ত ছিলেন। ভাবরা গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। মা চাইতেন ছেলে সংস্কৃত পড়ে পণ্ডিত হোক। আর বাবা চাইতেন ইংরেজি শিখে সরকারি চাকরি করুক। বেশি বয়সে মায়ের কথাটাই রেখেছিলেন। আম খেতে খুব ভালবাসতেন। একদিন আমবাগান থেকে আম চুরি করেন। রাশভারী বাবার ছিল পুলিশের চাকরি। বাগানের মালি এসে নালিশ করলে বাবা ক্ষমা চাইতে বললেন। স্বাভিমানী কিশোর অস্বীকার করল। বাবার সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল পায়ে হেঁটে ৪০ কিমি দূরের স্টেশনে মাত্র ১৩ বছরের বালক। কৈশোরেই ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের সাথে তাঁর পরিণয় হয়েছিল। দুঃসাহসী কিশোর, বিনা টিকিটে চেপে বসেন চলন্ত দূরপাল্লার ট্রেনে। ঘুম ভেঙে দেখেন পৌঁছে গেছেন বোম্বে স্টেশনে। স্টেশনের বাইরেই ছিল এক রেস্তোরাঁ। ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত বালক শ্রমের বিনিময়ে খাবার চাইলেন। দুবেলা বাসন মেজে পেট ভরাতে লাগলেন। উদ্যমী বলিষ্ঠ বালকটি দৈনিক দুআনা বেতনে রাজমিস্ত্রিদের সাথে শ্রমিক হয়ে নির্মাণশিল্পে যোগ

দিলেন। বিপ্লবী ভগতের মতো তাঁরও সিনেমা দেখার খুব শখ ছিল। কয়েক মাসেই, বেতনের টাকায় একজোড়া শার্ট-ধুতি কিনে টিকিট কেটে বেনারসের ট্রেনে চাপলেন। নিয়তির অমোঘ লিখনে কাশী বিদ্যাপীঠে ভর্তি হয়ে কয়েক বছরেই সংস্কৃত আর হিন্দিতে স্নাতক হলেন। সেকালে কাশী বিদ্যাপীঠ ছিল বিপ্লবীদের ভরকেন্দ্র। শহিদ শিবরামহরি রাজগুরু, স্বর্গীয় লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু দেশভক্তই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

চন্দ্রশেখরের শরীর ছিল কুস্তিগীরদের মতো। নিয়মিত ব্যায়াম, অস্ত্র চালানো, সাঁতার আর ঘোড়ায় চড়া শিখেছিলেন শুধুমাত্র দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের জবাব দেবেন বলে। একদা সবজি বাজারে এক ষণ্ডামার্কা গুণ্ডা কোনও যুবতীকে কুপ্রস্তাব দিয়ে অগ্রসর হলে চন্দ্রশেখর খালি হাতে তাকে এমন প্রহার করেন যে সে জীবনে এমন কাজে আর কখনও প্রবৃত্ত হয়নি। ঘটনাটিতে শহরময় চন্দ্রশেখরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে! তরুণ চন্দ্রশেখর প্রথমে গান্ধীর সেবাদলে যোগ দিয়েছিলেন। আন্দোলনে গ্রেপ্তারও হলেন অচিরেই। জেলপুলিশ সর্দার সিং বেতের ঘায়ে তাঁকে আধমরা করে দিল। প্রতিটি আঘাতের সাথে আর্তনাদের পরিবর্তে 'বন্দে মাতরম' ও 'গান্ধীজী জিন্দাবাদ' ধ্বনি জেলের প্রাচীর ভেদ করে শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিল। রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। শেষে ক্লান্ত, বিরক্ত ও অনুতপ্ত জেলপুলিশ, রক্তাক্ত চন্দ্রশেখরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে স্বহস্তে তাঁর সেবশুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন।

রেভারেন্ড উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী আর অক্টাভিয়ান হিউম ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের স্থাপনা করেন কিন্তু ১৯১৫ সাল পর্যন্ত সেই তথাকথিত রাজনৈতিক পার্টিটি ব্রিটিশের তাঁবেদারিই করছিল। একদিকে গান্ধীজীর অসহযোগ আর স্বদেশী আন্দোলন অন্যদিকে সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাকুল যুবসম্প্রদায়!

বেনারসে বিপ্লবী প্রণবেশ চ্যাটার্জী চন্দ্রশেখরকে পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য চন্দ্রশেখর আগুনে হাত রেখে আত্মবিসর্জনের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ সালে গোরখপুর জেলে, পণ্ডিতজীকে ফাঁসি দেওয়া হল। তাঁরই তৈরি 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'কে পুনর্গঠিত করে, সাম্যবাদী চন্দ্রশেখর আজাদ নাম রাখলেন 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'। তিনি গান্ধীজীর কংগ্রেসে এসে বড় নেতা হতে পারতেন। জেলে রাজসিক আরামে রাজনৈতিক বন্দিজীবন যাপন করতেন! কিন্তু ইংরাজের দাসত্ব তিনি অস্বীকার করেন! উনি ছিলেন সহিংস পথের পথিক! ভগত সিং, শুকদেব আর শিবরামের মতো বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আজাদ। তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, রবীন্দ্রনাথ কর এবং যোগেশ চ্যাটার্জীর মতো বিপ্লবীরাও 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। প্রচার, প্রসার, অস্ত্র এবং সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ছিল কঠিন সমস্যা। জনতা ইংরেজের ভয়ে ইচ্ছা থাকলেও সহযোগিতা করত না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় 'কাঁকোরি ট্রেন- ডাকাতি' সংঘটিত হয় ৯ আগস্ট, ১৯২৫। লখনৌ থেকে ১৬ কিমি দূরে ছিল কাঁকোরি। রাজেন্দ্র লাহিড়ী, কেশব চক্রবর্তী, আজাদ, আসফাকুল্লা আর পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল সৃষ্ট এইচ. আর. এর বিপ্লবীরা মাত্র চারটি জার্মান মাউজার পিস্তল নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, নিরীহ ট্রেনযাত্রীদের হত্যা না করে, বিনা রক্তপাতে, ব্রিটিশের লুটের টাকা উদ্ধার, সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ এবং জনমানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। ওই ট্রেনে গার্ডের কামরায় ব্যাগভর্তি টাকা লখনৌর খাজাঞ্চিখানায় জমা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ডাকাতি করে পাওয়া গেল মাত্র আট হাজার টাকা। কিন্তু মন্মনাথ গুপ্তার গুলিতে একজন যাত্রী অনিচ্ছাকৃতভাবে গোলাগুলি বিনিময়ের সময়ে মারা পড়লেন। মোট ৪০ জন ধরা পড়ল। সেপ্টেম্বর, ১৯২৫-এ সাহারানপুরে ধরা পড়লেন পণ্ডিতজী নিজে আর দশমাস পরে আসফাকুল্লা গ্রেপ্তার হলেন দিল্লিতে। চন্দ্রশেখর আর কুন্দনলাল আত্মগোপন করে রইলেন। 'সারফারোসি কি তামান্না আব হামারে দিল মে হ্যায়; দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজু ইয়া কাতিল মে হায়।' আসফাকুল্লা, রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্রনাথ, ঠাকুর রোশনসিংকে ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে ফাঁসি দেওয়া হল। বাকিদের কালাপানির সাজা হলো। মদনমোহন মালব্য তৎকালীন গভর্নর জেনেরাল এডওয়ার্ড ফ্রেডিক উডের দরবারে ৭৮ জন বিধান পরিষদের সদস্যের স্বাক্ষরসহ আবেদন করেছিলেন। সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের অসমযুদ্ধ কিন্তু ছিল অব্যাহত।

গান্ধীজী সেসময় তাঁর ইংরাজী পত্রিকা ইয়ং ইন্ডিয়াতে, 'কাল্ট অফ বম্ব', শীর্ষক বিপ্লবীদের বিপক্ষে আর ব্রিটিশের পক্ষে বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখলেন। আজাদও গান্ধীকে তীক্ষ্ণ ভাষায় দীর্ঘ পত্রে উত্তর দিলেন। চন্দ্রশেখর দ্বিগুণ উৎসাহে ভেঙ্গে যাওয়া এইচ. আর. একে পুনর্গঠিত করেন। তখন ব্রিটিশের গ্রেপ্তারি পরওয়ানায় তাঁর মাথার দাম ছিল দুহাজার টাকা। আত্মগোপন করে ঝাঁসি, কানপুর, মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাবে নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ঝাঁসিতে সাতরা নদীর তীরে হনুমান মন্দিরে পণ্ডিত হরিশঙ্কর ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে রোজ সন্ধ্যায় রামায়ণ পাঠ করতেন। গভীর রাত্রে ঝাঁসির অর্চা জঙ্গলে বিপ্লবীদের শুটিং শেখাতেন।

মন্দিরে স্ত্রীলোকের আনাগোনা ছিল। যুবক চন্দ্রশেখর মহিলাদের মাতৃসমান দেবীরূপে দেখতেন। একদিন নদীতে পা

ধোয়ার সময় একটা সাপ তাঁর দুটি পা জড়িয়ে ধরল কিন্তু দংশন করল না। এই দৃশ্যে মহিলারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে আজাদের মধ্যে বিভূতিসম্পন্ন সাধুর সন্ধান পেল। একজন মধ্যবয়স্কা তাঁর বাড়িতে পুত্রস্নেহে আজাদের থাকার বন্দোবস্ত করলেন এবং তার দুই কন্যাকে হিন্দি ও সংস্কৃত শেখানোর দায়িত্ব দিলেন। অনেকদিন এভাবে আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু মনেপ্রাণে সর্বদা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছিলেন। পাঞ্জাব থেকে ভগতের ডাক এল। লালা লাজপৎ রায় হত্যার প্রতিশোধ নিলেন। ১৯২৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর লালাজীকে লাঠির আঘাতে হত্যা করেছিল লাহোরের পুলিশ সুপার কর্নেল স্কট। ১৭ই অক্টোবর ভগত সিং গুলি চালালেন। কিন্তু 'বিধির বিধান কে করে খণ্ডন'। সাদৃশ্যতার কারণে ভোরের কুয়াশায়, ভুলবশত মারা পড়ল মেজর জেমস সান্ডার্স, সহকারী পুলিশসুপার। চন্দ্রশেখর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, ভগত, জয়গোপাল আর শুকদেবদের ডি.এ.ভি কলেজের হস্টেলের দিকে পালাতে সাহায্য করছিলেন। তাঁর বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও কনেস্টবল চননসিং ভগতদের পিছনে ধাওয়া করছিল। বাধ্য হয়ে গুলি চালিয়ে তাকে নিরস্ত করলেন। জে. এন. ইউ-এর প্রোফেসর চমনলালের পুস্তক অনুসারে রাজগুরুর গুলিতেই সান্ডার্সের মৃত্যু হয় কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত করতেই ভগতসিং তার উপর পুনরায় গুলি চালান। আজাদের বিখ্যাত উক্তি, 'হাওয়াই জাহাজ মাটিতে সুরক্ষিত। আকাশে অসুরক্ষিত হলেও মহান কাজের জন্য ঝুঁকি নেয়'।

লাহোরে ভগতসিং, 'নবভারত সভা' গঠন করেন। রাউলাট আইন অমান্য, মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারসাধন এবং সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে সারাদেশ বিক্ষোভ ও আন্দোলনে তোলপাড় হচ্ছে। এরমধ্যেই বিপ্লবীরা লালা লাজপৎ রায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ, লাহোর ও সাহারানপুরে বোমা কারখানা ও দিল্লির অ্যাসেম্বলি হলের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে লাগাতার ভারত ত্যাগের হুমকি দিতে থাকে।

১৯২৯ সালে ৮ই এপ্রিল, তখনকার ভাইসরয়, লর্ড আরউইন, 'পাবলিক সেফটি' আর 'বাণিজ্য বিতর্ক' নামের দুটি আইন প্রণয়ন করে। প্রথমটিতে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনও আন্দোলন আর দ্বিতীয়টিতে কারখানার শ্রমিকরা দাবিদাওয়া নিয়ে কোনও বিক্ষোভ দেখালেই তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি পার্লামেন্টে বিপ্লবীরা বোমা বিস্ফোরণ করেছিল বিপ্লবের জন্য। দিল্লির অ্যাসেম্বলি হলে, সেরকমই, ৬ই এপ্রিল, ১৯২৯তে, ওই দুই আইন পাশ হবার দুদিন আগে, ভয়ঙ্কর ধোঁয়া আর শব্দ সৃষ্টিকারী দুটি বোমা ফাটিয়ে, বিনা হত্যা বা রক্তপাতে, ইংরেজ সরকারকে হুঁশিয়ারি দেওয়া এবং দেশবাসীকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে এই অভিযান চালানো হয়। আজাদ নিজেই যেতে চেয়েছিলেন। সাব্যস্ত হল রামশরণ দাস যাবে। কিন্তু শেষে, বটুকেশ্বর আর ভগত ওই নিশ্চিত মৃত্যুর অভিযানে শামিল হলেন। হলোও তাই! স্বেচ্ছায় তাঁরা ধরাও দিলেন।

লাহোরের বোমা কারখানায় বাইরের নালি দিয়ে বয়ে যাওয়া হলুদ পিকরিক এসিডের সূত্র ধরে পুলিশ জয়গোপাল আর শুকদেবকে গ্রেপ্তার করল। অসহনীয় অত্যাচারে তাঁরা সমস্ত বিপ্লবীদের ঠিকানা বলে দিল। চারিদিকে ধড়পাকড় চলছে। সংগঠন ভেঙ্গে পড়েছে। বিপ্লবী যশপাল ভাইসরয় আরউইনের ট্রেনের কামরা উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করলে, দুর্ভাগ্যবশত ভগবতীচরণ নিজেই বোম বিস্ফোরণের শিকার হলেন। কমরেড বীরভদ্র ও কৈলাশপতির অসহযোগিতায় আজাদ মর্মাহত হয়েছিলেন। গোয়ালিয়র, কানপুর, এলাহাবাদে আত্মগোপন করে প্রচার প্রসারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষে এলাহাবাদের অ্যালফ্রেড পার্ক, ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ এ শুকদেব রাজের সাথে আজাদ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য সম্মিলিত হন।

এক দেশদ্রোহী ব্রিটিশের অনুগ্রহের লোভে পুলিশকে আজাদের অবস্থান জানালে, বিরাট বাহিনী পার্কটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাইফেল দিয়ে এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগল। আজাদ তাঁর কোল্ট পিস্তল দিয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে তিনজন ব্রিটিশকে হত্যা আর চারজনকে আহত করেন। রক্তাক্ত ও আহত আজাদ শেষ গুলিটি নিজের ডান কানের উপর রেখে আত্মহত্যা করলেন কিন্তু ধরা দিলেন না। আজাদ বলেছিলেন, 'শত্রুর গুলির মোকাবিলা আমরা করব', আমি আজাদ, আজাদই থাকবো। মাত্র ২৩ বছরের তরতাজা যুবক শহিদ হলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সুজিত আজাদের দাবি, সেদিন সকালেই নেহেরুর সাথে চন্দ্রশেখরের দেখা এবং ঝগড়া হয়। তিনি কারারুদ্ধ ভগতের মুক্তিপণ হিসাবে এইচ.এস.আর তহবিলটি তার হাতে তুলেও দেন। নেহেরুজী তার আত্মজীবনীতে আজাদের সাথে ১৯৩১ সালে প্রথমে দেখা করার কথা স্বীকারও করেছেন। তহবিলের কথাটা অবশ্য তোলেননি। পুলিশ কিভাবে আজাদের গোপন আস্তানার খবর পেয়েছিল, সেটা বুদ্ধিমান পাঠক ঠিকই অনুমান করবেন। নেতাজী সুভাষকেও এইভাবে এক দেশদ্রোহীর বিশ্বাস-ঘাতকতায় আত্মবলি দিতে হয়েছিল। আজও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। একদিকে ক্ষমতালোভী রাজনেতারা ফুলেফেঁপে উঠছে। অন্যদিকে যথার্থ দেশভক্তরা ভারতের তথাকথিত আইনব্যবস্থা, সেকুলারিজম, গণতন্ত্র আর সংবিধানের চাপে নিষ্পিষ্ট হচ্ছেন! ▯

শোকসংবাদ

কাঁথি জেলার ভবানীচক গ্রামের প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য প্রকাশ চন্দ্র মণ্ডলের মাতৃদেবী লীলু মণ্ডল ৩ আগস্ট মঙ্গলবার পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ৩ পুত্র ও ২ কন্যা, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক রেখে গেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

গোবর থেকে মাছের খাবার তৈরি

শান্তি মণ্ডল

আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে পশ্চিমবঙ্গে মাছ চাষ একটি বিশেষ শিল্পে পরিণত হয়েছে। যেখানে অনেক মানুষের রুজিরোজগার ও অর্থনীতি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। মাছ চাষ বেড়ে যাওয়ায় মাছের খাবার তৈরির প্রয়োজনীয়তাও ক্রমশ বাড়ছে। আমরা এখানে একটি মাছের খাবার তৈরির পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব, যা খুব সহজে মাত্র ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে শুরু করা সম্ভব এবং কমপক্ষে মাসে ২০ হাজার টাকা আয় আসে। এটি একটি বিশেষ প্রকার রস যা Phytoplankton ও Zooplankton তৈরিতে সাহায্য করে এবং মাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে থাকে।

এই পদ্ধতিতে সদ্যসংগৃহীত গোবরকে ভালো করে ধুয়ে এক বিশেষ প্রকার জীবাণুর সঙ্গে গরম জল সহযোগে মিশিয়ে একটি বদ্ধপাত্রে ৩-৪ দিন রাখা প্রয়োজন। মিশ্রণের সঙ্গে অবশ্যই প্রোটিন পাউডার (উদ্ভিদ) ও জৈব কার্বনের সমন্বয় দরকার। ৩ দিন পর এক অদ্ভুত গন্ধনিসৃত হলে বুঝতে হবে যে কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

অতঃপর এই রস ১০ লিটার একরপতি দেওয়া প্রয়োজন। প্রতি মাসে একবার অবশ্যই দিতে হবে ও ১০ দিনের মধ্যে প্ল্যাংকটন-এর সংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

উপকারিতা :

(১) প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি থাকার কারণে প্ল্যাংকটন-এর খুব সহজ হয়। (২) জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন বা গুণমান হ্রাস করে না। (৩) এটি জলের রং পরিবর্তন করে যা সূর্যালোক থেকে তাপ শোষণ করে জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে ও মাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় (৪) মাছের রোগ হ্রাস করে। পুকুর থেকে পরজীবী ব্যাকটেরিয়ার উপদ্রব কমায়। (৫) পিএইচ নিরপেক্ষ থাকে ও ধরে রাখতে সাহায্য করে যা মাছের বৃদ্ধির উৎস।

এই মুহূর্তে ৪ জন বেকার যুবক নিজেরা এই উৎপাদন শুরু করেছে।

গোরুর প্রস্রাবভিত্তিক ন্যানোফারটিলাইজার পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভিদ বৃদ্ধির প্রবর্তক :

কৃষিক্ষেত্রে ন্যানোফারটিলাইজার প্রয়োগের লক্ষ্য হলো সার ও খনিজ লবণের ক্ষয় হ্রাস করা ও চাষির অযাচিত ব্যয় হ্রাস করা। সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলন বাড়াতে গোমূত্র সহযোগে ন্যানোফারটিলাইজারের প্রয়োগ পরিবেশ বান্ধব, সুদর প্রসারী ও কৃষক সহায়ক। এই সার গতানুগতিক সারের তুলনায় খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এবং যথেষ্ট কার্যকরী।

আয়ুর্বেদের মতে গোমূত্র মানব শরীরের একাধিক সমস্যার নিরাময় করতে সক্ষম। গোরুর প্রস্রাব একাধিক কর্মসংস্থানের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। গোমূত্র ভিত্তিক ন্যানোফারটিলাইজার একটি অন্যতম ভবিষ্যত কর্মসংস্থান ও চাষিবন্ধুর ব্যয় সংকোচের অন্যতম উপাদান হিসেবে দেখা দিতে পারে।

এই পদ্ধতিতে গোমূত্র (পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন) ও প্রয়োজন মতো মিনারেলস ১০০° সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট ধরে গরম করলে মিনারেসগুলি গোমূত্রের জারক দ্রব্যের উপস্থিতিতে জারিত হয়ে ১০০ ন্যানোমিস্টার সহজেই ন্যানোমিটারে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অতপর ২৪ ঘণ্টা স্থিরভাবে রেখে দিলে, উপরিভাগে শুধুমাত্র ১০-৫০ সাইজে কণাগুলি ভাসতে থাকে ও অন্যান্য বড়ো বড়ো কণা ও বর্জ্য পদার্থ নীচে জমা হয়। এই সময় শুধুমাত্র উপরিভাগ সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণের একটি দুর্দান্ত সংযোগ ঘটানো হয়। উল্লেখযোগ্য হলো— বিভিন্ন সবজি, ধান, ও আলুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে সংমিশ্রণ বানানো হয়। এই মিশ্রণ প্রয়োগ করলে অনিবার্য ভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি, উৎপাদন ও রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এই মুহূর্তে ১০০ জনেরও বেশি চাষি প্রয়োগ করে সুফল পেয়েছে ও ১০-১২ জন চাষিবন্ধু নিজের ব্যবসাভিত্তিক শুরু করেছে।

(লেখক বিশিষ্ট প্রযুক্তবিদ)